# গোর্খাভূমির বৃত্তান্ত

বাবু সিংহরায়

প্রাককথন: গত জুলাই মাসের মাঝামাঝি এপিডিআরের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে দার্জিলিংয়ে গিয়েছিলাম। তখন পাহাড় বন্‌ধে থমকে ছিল। ফিরে এসে সেখানকার কথা লিখতে লিখতে পেরিয়ে গেল দু'টি মাস। ইতিমধ্যে পাহাড় দিব্যি সচল হয়ে উঠেছে। আমাদের রাজ্য প্রশাসন গোর্খাদের মধ্যে গুটিকতক নিজের লোক খুঁজে পেয়েছে মনে হয়। তা নিয়ে নিত্যনতুন রঙ্গতামাশা জমছে বেশ। এখনও পর্যন্ত গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে অনড় আছেন বিমল গুরুং। এই ভদ্রলোক একদা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, আমি কিষেণজি নই। অর্থাৎ রাষ্ট্রের বাঁধা ছক ভেঙে আন্দোলন করায় তাঁর বিশ্বাস নেই। এখন শুনছি, তিনিও জঙ্গলে আত্মগোপনে করেছেন, অনেকটা কিষেণজির মতোই। পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ তাঁকে খুঁজছে। খুঁজে পেলে তাঁর অন্তিম পরিণতিও কিষেণজির মতো হতে পারে।
এখানকার খবরের কাগজগুলোতে লিখছে, বিমল গুরুং মরিয়া হয়ে দিল্লির সঙ্গে যোগাযোগ করছেন, মমতার মিটিংয়ে আমন্ত্রণ পাওয়ার জন্য ঝুলোঝুলি করছেন। কথাগুলো কতদূর সত্যি কে জানে!
লেখা যখন শেষের পথে, একদিন সকালে পাহাড়ের অরুণ ঘাটানি নামে এক ভদ্রলোককে ফোন করলাম, পাহাড়ের অবস্থা কেমন বুঝছেন? এই ভদ্রলোক শিলিগুড়িতে থাকেন। আমাদের ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমকে অনেক সাহায্য করেছিলেন। পরে তাঁর কথা লিখেছি।
তিনি আমার প্রশ্ন শুনে বললেন, বাংলা পত্রিকায় আর চ্যানেলে যা দেখাচ্ছে সব ভুলভাল। গভর্নমেন্ট একটা ব্যাংক খুলিয়েছে, জোর করে দু'-চারটে দোকান খুলিয়েছে আর বলছে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসছে। সব বাজে কথা। আরে ব্যাংক যে খুলবে, ইন্টারনেট তো চাই। না হলে কি এখনকার দিনে ব্যাংকের কাজ হয়? এদিকে পাহাড়ে এখনও ইন্টারনেট চালু করেনি। তা হলেই বুঝুন, ব্যাংকে কেমন কাজ হচ্ছে। এই জিএসটি-র জমানায় দোকান খুলতে গেলেও তো ইন্টারনেট লাগে, খদ্দেরকে বিল দিতে হয়। ইন্টারনেট ছাড়া দোকানই বা খুলল কী করে!
ওরা বিনয় তামাং আর অনীত থাপাকে হিরো বানাতে চায়। ওদের মিছিলে গুটিকতক লোক হয়েছিল বড় করে দেখাচ্ছে। আরে ওদের মিছিলে তো সিভিক ভলান্টিয়াররা গিয়েছিল, তাদের পরিবারের লোকজনও ছিল। পানিঘাটায় ওরা মিছিল করেছে, সেখানে চা বাগানের আদিবাসী শ্রমিকরা গিয়েছিল।
বিনয় তামাং আর অনীত থাপা ওদের বড় দালাল হয়েছে। ঘিসিংয়ের দলবলও ওদের সঙ্গে আছে। কিন্তু আমি আপনাকে বলছি, পাহাড়ের হাজার হাজার মানুষ এখনও রাস্তায়। দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্শিয়াং সব জায়গায় মিছিল হচ্ছে।
আমি বললাম, মিডিয়া যে আপনাদের আন্দোলনের নামে কুৎসা করছে সেকথা আমরাও বুঝি।
এর মধ্যে এপিডিআরের ধীরাজ সেনগুপ্তকেও ফোন করে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, পাহাড়ের অবস্থা কেমন বুঝছেন দাদা? তিনি বললেন, রাজ্য সরকার তো কোনও কথাই শুনতে রাজি নয়। পুরো ব্যাপারটাকে ক্রিমিন্যাল ম্যাটার হিসাবে ট্রিট করছে। সবকিছু সিআইডি-র হাতে ছেড়ে দিয়েছে। মানুষকে জব্দ করার জন্য যতরকম ফন্দিফিকির আছে, সব প্রয়োগ করে চলেছে। সরকার গুরুং-টুরংদের মানবে না, পাহাড়ের নেতৃত্বকে মানবে না। নিজেদের কিছু লোক ঠিক করেছে, তাদের দিয়ে মিটিং-মিছিল করাবে, বিরোধী বলে কিছু রাখবে না। এখন সরকার খুল্লামখুল্লা ওই পলিসিতে চলছে।
আমার মনে হল অরুণবাবু এবং ধীরাজদা, দু'জনে ঠিকই বলেছেন। তবে যে কোনও আন্দোলনে এমনতর ওঠাপড়া, ষড়যন্ত্র, কুৎসা ও বিশ্বাসঘাতকতা থাকেই। গোর্খাদেরও ওইসব অতিক্রম করতে হবে। হয়তো তাতে কয়েক প্রজন্ম লেগে যাবে।
আমি এই লেখায় দেখিয়েছি, গোর্খারা অতীতে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ প্রভুদের ভাড়াটে সৈনিক হিসাবে বহুবার দেশবিরোধী যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে, গণ আন্দোলনের ওপরে হামলা চালিয়েছে ও আরও নানাপ্রকার পাপকর্ম করেছে। এখন আবার গোর্খাভূমির দাবিতে সংগ্রামে নেমে রাষ্ট্রের চণ্ডনীতির শিকার হচ্ছে। এমনতর দুঃখবরণের মধ্যে দিয়েই তাদের পাপস্খালন হবে। এইভাবে পাপমুক্ত হয়ে তারা স্বাধীন ও শক্তিশালী জাতি হিসাবে বিশ্বের সামনে আত্মপ্রকাশ করবে।

১১, ০৯, ২০১৭

১

২০ জুলাই ২০১৭ তারিখের সন্ধেটা আমি জীবনে কখনও ভুলতে পারব বলে মনে হয় না। ওই সময় আমার সঙ্গে এক দুঃখী গোর্খা পরিবারের আলাপ হয়েছিল। আমি ও আমার সঙ্গীরা এক অতি বিপজ্জনক পার্বত্য পথ পার হয়ে তাদের বাড়িতে গিয়েছিলাম। পরে আমাদের মনে হল, এমন ঝুঁকি নেওয়া ও কষ্ট স্বীকার করা সার্থক। সেই অভিজ্ঞতার কথা দিয়ে এবারের লেখা শুরু করছি।
আমি ও আমার কয়েকজন বন্ধু গত ১৮ জুলাই এপিডিআরের পক্ষ থেকে গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন নিয়ে তথ্য অনুসন্ধান করার জন্য দার্জিলিং জেলায় গিয়েছিলাম। ২০ জুলাই সকালে আমাদের অনুসন্ধান শুরু হয়। আমরা দু'টি ভাগে বিভক্ত হয়ে দার্জিলিংয়ের দুই প্রান্তে যাত্রা করি। এপিডিআরের সম্পাদক ধীরাজ সেনগুপ্ত এবং আরও কয়েকজন দার্জিলিং শহরের দিকে গিয়েছিলেন। আমরা পাঁচজন, আমি, জয়গোপাল দে, আলতাফ আহমেদ, শ্যামসুন্দর সাহা এবং সুমন গোস্বামী গিয়েছিলাম বিজনবাড়ির দিকে।

আমরা ছিলাম টাটা সুমো গাড়িতে। তার বনেটের ওপরে হলুদ রংয়ের ফ্লেক্স আটকানো ছিল। তার ওপরে লাল কালিতে বড় বড় করে লেখা এপিডিআর। গাড়ির পিছনেও এপিডিআর লেখা আর একটা ফ্লেক্স। পাহাড়ের বাসিন্দারা বাইরের গাড়ি ঢুকতে দিচ্ছে না। কিন্তু তারা এপিডিআরকে বাধা দেবে না বলেছে। তাই গাড়ির সামনে পিছনে ওইরকম এপিডিআর লেখা ফ্লেক্স সাঁটা আছে, যাতে পথে কেউ না আটকায়।

শিলিগুড়ি থেকে কালিম্পং হয়ে ঘুম। ঘুম পেরিয়ে সোনাদা। সেখান থেকে আমাদের আর ধীরাজদাদের পথ আলাদা হয়ে গেল। আমাদের সঙ্গে সুমোর চালক আছে, নাম সন্তোষ। আর আছে জনৈক নেপালি গাইড। তার নাম জে কে। দু'জনেই গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের ঘোর সমর্থক। বিকেল নাগাদ তারা বলল, আমাদের কমজর বস্তি নামে এক জায়গায় নিয়ে যাবে। সেখানে একজন ভিকটিমের বাড়ি। সেই ভিকটিম পুলিশের গুলিতে মারা গেছে। আমাদের সঙ্গে তার পরিবারের দেখা করিয়ে দেবে।

এখন শ্রাবণ মাসের শুরুর দিক। পাহাড়ের পথঘাটের অবস্থা ভালো নয়। মাঝে মাঝে পিচবাঁধানো, কখনও আবার ভাঙাচোরা পাথুরে রাস্তায় চলেছে গাড়ি। অনেক দূরে সুউচ্চ নীল রংয়ের পর্বতশ্রেণি। তাদের পাশ দিয়ে ভেসে চলেছে সাদা মেঘের দল। আকাশে একটু ওপরের দিকে ঈষৎ কালো আভাযুক্ত বাদল মেঘেরাও আছে। রাস্তার দু'পাশে পর্বতশ্রেণি গাঢ় সবুজ অরণ্যে ঢাকা। পাহাড়ের ঢালে চা বাগানগুলোও দেখা যায়। দূর থেকে মনে হয় পাহাড়ের গায়ে মিহি সবুজ, অতি মোলায়েম গালচে পাতা।

পথে একটা নদী পড়ল, বেশ খরস্রোতা, অনেক দূর থেকে জলের কলকল শব্দ পাওয়া যায়। গাইড বলল, ওর নাম রাম্মাম। নদীর ওপরে লোহার তার দিয়ে ঝোলানো ব্রিজ। তার ওপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে গেলাম। গাড়ির ভারে সেতু থরথরিয়ে কেঁপে উঠল।

বিকেল ছ'টা। মেঘমালার গায়ে অস্তসূর্যের আলো লেগে আছে। আমাদের গাড়ি পাথুরে পথে আচমকা ব্রেক কষল।

-কী হল, গাড়ি থামল কেন?

গাইড বলল, গাড়ির রাস্তা এখানে শেষ। বাকিটা পায়ে হেঁটে যেতে হবে।

হেঁটে যে যাব তার পথ কোথায়? সামনে তো খাড়াই পাহাড়। গাইড বলল, ওই পাহাড়ের গা বেয়েই তো উঠতে হবে।

আমরা বিকেলের অবশিষ্ট আলোয় লক্ষ্য করলাম, পাহাড়ের গায়ে ঘন গাছপালার ফাঁক দিয়ে খুব সরু একটা পথ উঠে গেছে ওপরে। যাকে বলে সুঁড়িপথ। ওই পথ বেয়ে ওঠা নিতান্ত সহজ কথা নয়।

সহজ নয়, কিন্তু উঠতে তো হবে। আমাদের গাইড উঠছে আগে আগে, পিছনে যথাক্রমে জয়গোপাল, আফতাব, সুমন, আমি ও শ্যামবাবু। খানিক ওঠার পরে সন্ধে ঘনিয়ে এল। এ এমন এক পথ, যেখানে পথের পাশে বাতিস্তম্ভ থাকার কথা কল্পনাই করা যায় না। এই পথের শেষে এক কৃষক পরিবার বাস করে। তাদের একটি ছেলে শহিদ হয়েছে।

আমরা সেই পথ বেয়ে উঠছি, এমন সময় ঝিরঝিরিয়ে বৃষ্টি নামল। মনে মনে ভাবছি, এই রাস্তায় যদি কাদা থাকত, তা হলে আর দেখতে হত না। পা হড়কে পতন অনিবার্য ছিল। কিন্তু খানিক যেতে বুঝলাম, পাথুরে পথও খুব নিরাপদ নয়। বৃষ্টিতে ভিজে বেজায় পিছল হয়ে আছে। পা ফসকালেই পড়ে হাত-পা ভাঙবে।

যত উঠছি, পথ যেন তত বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। এখানকার পথ অনেকটা সিঁড়ির মতো, ধাপে ধাপে উঠে গেছে ওপরের দিকে। তবে ধাপগুলি খুব অসমান। এক-একটা ধাপ প্রায় তিন-সাড়ে তিন ফিট উঁচু, পায়ে ডিঙি মেরে উঠতে হয়। কোনও কোনও ধাপ আবার ভীষণ সরু, তার ওপরে পা রাখা মুশকিল। কোথাও আবার বেশ সুবিধা, পথের ধারে গাছের গুঁড়ি ধরে দিব্যি ওপরের ধাপে ওঠা যায়। আমাদের সমতলের লোকেরা এইরকম রাস্তার কথা কল্পনাতেও আনতে পারবে না।

আমাদের শ্যামবাবু অর্ধেকটা উঠে হাল ছেড়ে দিলেন। তাঁর বড় বড় নিঃশ্বাস পড়ছে, আর পারছি না, দম ফুরিয়ে গেছে, আমি নামছি। বাবুদা, ভালো চান তো আপনিও নেমে আসুন। আমার মনে পড়ল, আমাদের বাড়ির সামনে জিটি রোড দিয়ে যখন ছেলেরা বাঁক নিয়ে তারকেশ্বরে যায়, তাদের একটা কথা বলতে শুনেছি,

বাবা বহুত দূর হ্যায়

যানা ভি জরুরি হ্যায়

এখন আমার ক্ষেত্রেও ওই কথাটা প্রযোজ্য। যানা ভি জরুরি হ্যায়। আমরা মানবাধিকারকর্মী, পীড়িত লোকজনের কাছে আমাদের পৌঁছে যেতেই হবে। তাঁদের সান্ত্বনা দিতে হবে। অত্যাচারের বিহিত করার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টাও করতে হবে। তাই শ্যামবাবুকে বললাম, আমি একটু আস্তে আস্তে উঠছি, মনে হয় খানিক দেরি হলেও পৌঁছে যাব ঠিক।

আমাদের সেই নেপালি গাইড ততক্ষণে অভ্যস্ত পদক্ষেপে তরতরিয়ে উঠে গেছে ওপরে। জয়গোপাল, আফতাব, সুমনও আমাকে ফেলে এগিয়ে গেছে।

পুরো পথ পেরতে লাগল আধঘণ্টা। পথের শেষে সেই শহিদের বাড়ি। আশপাশে আর কোনও জনবসতি নেই। পাহাড়ের ওপরে এমন বিজন জায়গায় ওরা কীভাবে থাকে কে জানে। এখানে এলে বোঝা যায় না, সম্প্রতি পৃথিবীর লোকসংখ্যা ছুঁয়ে ফেলেছে এক হাজার কোটি। এবং ভারত বিশ্বের অন্যতম জনবহুল রাষ্ট্র।

পাহাড়ের ওপরে চাষির কুটির টিন দিয়ে তৈরি। তার কাছেই চাষের জমি। পাহাড়ের ঢালে শস্যক্ষেত। ধান, ভুট্টা, কমলা লেবু ইত্যাদি এখানকার ফসল। গ্রামে বিদ্যুৎ নেই। সন্ধে হলেই চারদিকে নিঝুম অন্ধকার। তখন আর বিশেষ কেউ পাহাড়ি পথে ওঠানামা করে না। এখানকার নিয়ম হল, লোকজন একটু রাত হলেই ঘুমিয়ে পড়ে। প্রাতঃকালে জেগে ওঠে খুব তাড়াতাড়ি। তবে এই গণআন্দোলনের সময় কিছুই আর আগের মতো নেই। পাহাড়ি লোকজনের জীবনযাত্রা, চিন্তাভাবনা, বদলে গেছে সব। বিশেষত আমরা যাদের বাড়িতে যাচ্ছি, তাদের একটা জোয়ান ছেলে কিছুদিন আগে মারা গেছে। তারা সেই শোক বুকে নিয়ে রাত জাগছে।

আমি যখন পাহাড়ের ওপরে পৌঁছলাম, ততক্ষণে থেমে গেছে বৃষ্টি। আমার কিছুক্ষণ আগে জয়গোপালরা পৌঁছে গিয়েছিল। আমি গিয়ে দেখি, শহিদের বাড়ির লোকেরা ওদের প্ল্যাস্টিকের চেয়ার পেতে উঠোনে বসতে দিয়েছে। সকলের মাঝখানে একটা মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির

নরম আলোয় সেখানটায় বেশ ঘরোয়া পরিবেশ।
এই পরিবারের সঙ্গে কথা বলে আমরা জানতে পারলাম, যিনি কয়েকদিন আগে মারা গেছেন, তাঁর নাম বিমল শাসনকর। বয়স ২৯। তাঁর পিতার নাম যশবাহাদুর শাসনকর। গত ১৭ জুন বিমল গোর্খাল্যান্ডের সমর্থনে এক মিছিলে যোগ দিয়েছিলেন। পুলিশ মিছিলের ওপরে গুলি চালায়। গুলি তাঁর মাথায় লেগেছিল।
বিমলের স্ত্রী আছেন। একটি ছেলেও আছে। তার বয়স চার-পাঁচ বছর। লাল রংয়ের একটা হাফ হাতা গেঞ্জি আর হলুদ রংয়ের প্যান্ট পরে আছে। গেঞ্জির ওপরে ইংরেজি হরফে লেখা, রাগবি। সে আমাদের দিকে জুল জুল করে চেয়ে দেখছে। তাকে সবাই বলতে লাগল, নাম বাতাও নাম বাতাও। সে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পরে বলল, উইলিয়াম শাসনকর।
এখানে বিদ্যুৎ নেই কিন্তু মোবাইল আছে। কোথায় চার্জ দেয় কে জানে। হয়তো নীচে নেমে কোথাও চার্জ দিয়ে আসে। ছোট্ট উইলিয়ামের হাতে সামসুংয়ের হ্যান্ডসেট। মোবাইলের স্ক্রিনে মৃত বাবার ছবি দেখাল। নেহাৎ সরল চেহারার পাহাড়ি যুবক, বেশ বলিষ্ঠ দেখতে। তার মৃতদেহেরও ছবি দেখাল। মাথা দিয়ে রক্ত গড়িয়ে নেমেছে মুখময়।
আমার মনে হল, ছোট্ট উইলিয়ম তার পিতার রক্তাক্ত দেহের ছবি থেকেই আগামী দিনে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস কাকে বলে জানতে পারবে। ছবিটি তার অবচেতনায় রয়ে যাবে জীবনভর।
কিছুক্ষণ বাদে তার মা এল। বছর পঁচিশের এক তরুণী। সাদা পোশাক পরা। চুলগুলি সাদা কাপড়ে ঢাকা। তার দিদিও কিছুদিন আগে এসেছে এই বাড়িতে। সম্ভবত বিমলের মৃত্যুর খবর পেয়ে স্বান্তনা জানাতেই তার আসা।
আমরা বিমলের বিধবা স্ত্রীকে প্রশ্ন করলাম, তোমাদের আন্দোলন কতদিন চলবে? সে খুব তেজের সঙ্গে জবাব দিল, যতদিন গোর্খাল্যান্ড না পাওয়া যাবে, ততদিন। রাজ্য সরকার চাইলেই তো গোর্খাল্যান্ড হয়ে যেতে পারে। ওরা একবার হ্যাঁ বলুক, তা হলেই হবে। ওরা যতদিন না রাজি হয়, ততদিন আন্দোলন চলবে। এতে আমাদের অনেক ক্ষতি হয়েছে। অনেকের ঘর থেকে মানুষ শহিদ হয়েছে। আর আমরা গোর্খাল্যান্ড না পেয়েই আন্দোলন গুটিয়ে নেব? তা কখনও হয়!
আমরা সেই তরুণীকে বললাম, বিমলের মৃত্যুতে তোমরা কি ক্ষতিপূরণ চাও? পরিবারের একজনের চাকরি চাও? কমপেনসেশান বাবদ টাকা চাও? আমাদের জানাও তোমরা কী চাইছ। আমরা হিউম্যান রাইটসের লোক। তোমার স্বামীর মৃত্যুতে যাতে ক্ষতিপূরণ পাও, তার জন্য চেষ্টা করব।
এইবার সে রীতিমতো ঝাঁঝিয়ে উঠল, আমরা সরকারের থেকে কিছুই চাই না। হমেঁ কুছ নেহি চাহিয়ে। আমার স্বামী গেছে, দরকার হলে আরও অনেকে যাবে, কিন্তু গোর্খাল্যান্ড না পাওয়া অবধি আমরা থামব না। তার জন্য যত রক্ত দিতে হয় দেব।
আমাদের ফিরে আসার সময় বিমলের বাড়ির লোকজন একত্রিত হয়ে স্লোগান দিতে লাগল, গোর্খাল্যান্ড জিন্দাবাদ, বিমল গুরুং জিন্দাবাদ। সবাইকে ছাপিয়ে সেই তরুণীর তীক্ষ্ণ কণ্ঠ শোনা যাচ্ছিল।
এই স্লোগানের মধ্যে দিয়ে সে কি মৃত স্বামীর স্মৃতি তর্পণ করছে?

ঘন অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে পাহাড়ের সেই বিপজ্জনক পথে নামতে নামতে আমি ভাবছিলাম, ওই পর্বতচারিণী কন্যাকে এখন গোর্খা জাতির প্রতিনিধি বলে ধরে নেওয়া যায়। তার স্বামী গোর্খা জাতির স্বার্থে জীবন উৎসর্গ করেছে। দরকারে সেও করবে। আরও অনেক প্রাণের বিনিময়ে তারা গোর্খা জাতির নিজস্ব বাসভূমি আদায় করবে। আরও হাজার হাজার গোর্খা তরুণ-তরুণী নিশ্চয় এমনই ভাবছে। নইলে পাহাড়ে এতবড় আন্দোলন হতে পারছে কেমন করে।
আমার মনে হল, পাহাড়ি ছেলেমেয়েদের এমন স্পিরিট, এই আত্মত্যাগের মনোভাব, এসব যদি ঠিকঠাক কাজে লাগানো যায়, তবে গোর্খা জাতি উদ্ধার হয়ে যাবে। কিন্তু সত্যিই তা হবে কি? ওদের বর্তমান নেতৃত্ব মানুষের এমন সংগ্রামী মনোবৃত্তিকে কাজে লাগিয়ে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করবে না তো?
কী হবে না হবে তার উত্তর সময়ের গর্ভে। কিন্তু বিশে জুলাই সন্ধেটা আমাদের কাছে বিশেষ মূল্যবান হয়ে রইল। আমরা শহিদ বিমল শাসনকরের পরিবারের সঙ্গে দেখা করে বুঝতে পারলাম, কোনও মৃত্যুতেই তাদের লড়াই থেমে যাওয়ার নয়।

২

দার্জিলিংয়ে ফ্যাক্ট ফাইন্ডিংয়ের বাকি কাহিনি বর্ণনা করার আগে গোর্খা জনজাতির পরিচয় ও তাদের ক্ষোভ-বিক্ষোভ নিয়ে দু'-চার কথা বলে নিই। তা হলে অতীতের প্রেক্ষিতে বর্তমানের আন্দোলনকে বুঝতে সুবিধা হবে।
আগে গোর্খাদের সম্পর্কে আমাদের ধারণা ছিল বেশ গোলমেলে। আমরা ছোটবেলায় শুনতাম, গরিব লোকেরা যদি দুষ্টুমি করে বাড়তি মজুরি কিংবা বোনাস চায়, তা হলে সরকার গোর্খাদের ডাকে। তাদের গায়ে ভীষণ জোর। তারা আচ্ছা করে পিটিয়ে সবাইকে ঠান্ডা করে দেয়। সেজন্য কলকারখানাতেও অনেক সময় গোর্খা দারোয়ান নিয়োগ করে। তারা খুব বিশ্বস্ত। দরকার হলে প্রভুর জন্য জান দিতে পারে।
শুধু শোনা কথা নয়, সেই ঊনষাট সালে দেখেওছিলাম তাদের। আমি তখন নিতান্ত বালক। সেবার খাদ্য আন্দোলনে বহু লোক হতাহত হওয়ার পরে চারদিকে খুব উত্তেজনা। কমিউনিস্ট পার্টি বন্‌ধ ডেকেছে। কোথাও ট্রাম-বাস চলবে না, দোকান-পাট, কলকারখানা খুলতে দেবে না, এমনি জেদ তাদের। আমাদের সালকিয়ায় তখন রাজগড়িয়া পদবীধারী এক ব্যক্তির বিরাট বড় জুটমিল ছিল। বন্‌ধের দিনে জুটমিলের সামনে গিয়ে দেখি গোর্খা নামিয়েছে। তারা কারখানার গেটের সামনে সার দিয়ে রাইফেল উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, মাথায় ভারী হেলমেট, তার নীচ দিয়ে হিংস্র ও সতর্ক চোখগুলি জনতাকে নিরীক্ষণ করছে।
সেদিন তাদের গুলিতে আমাদের পাড়ার এক ভদ্রলোক মারা গেলেন। তিনি বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান ছিলেন। কোনও সাতে-পাঁচে

থাকতেন না। অফিস যাওয়ার আগে স্নান করতে পুকুরে নেমেছিলেন। স্নান করে সদ্য উঠেছেন এমন সময় গোর্খাদের গুলি লাগল পেটে। সেই কাহিনি শুনিয়েছি অন্যত্র।

আরও একটু বড় হয়ে শুনেছিলাম, আটচল্লিশ সালে তেভাগা আন্দোলনের সময় এক গোর্খা সৈনিকের হাতে অহল্যা মা নিহত হয়েছিলেন। তিনি তখন আট মাসের গর্ভবতী। স্থানীয় জমিদারের লোকজন গোর্খা সেপাইদের নিয়ে তাঁদের চন্দনপিঁড়ি গ্রামে হানা দিয়েছিল। চাষিরাও ছাড়ার পাত্র নয়, লাঠিসোঁটা, বল্লম, সড়কি নিয়ে বাধা দিল। তারপর ধুন্ধুমার লড়াই।

চাষিদের দলে অহল্যা মা-ও ছিলেন। গোলমালের মধ্যে এক গোর্খা সৈনিক তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালাল। তারপর মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য তাঁর পেটটিও বেয়নেট দিয়ে চিরে দিল। অহল্যা মায়ের অজাত সন্তানের হাতটি ছিন্নভিন্ন পেট থেকে বেরিয়ে এসেছিল।

সেযুগে গোর্খাদের সম্পর্কে আরও অনেক ভয়ের গল্প শোনা যেত। বড়রা বলত, পাকিস্তান সীমান্তে গোর্খারা রাতদিন অতন্দ্র পাহারা দেয়। তারা যদি পাকিস্তানের বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েদের দেখতে পায়, তবে আর রক্ষা নেই। তাদের খুব মিষ্টি করে ডাকে, আও বাচ্চু ইধার আও, টফি দেগা, লজেঞ্জুস দেগা। সেকথায় ভুলে বাচ্চারা যেই কাছে আসে, অমনি কুকরি দিয়ে কচাৎ করে কেটে নেয় তাদের গলা। ওইরকম করে বলে পাকিস্তানিরা গোর্খা দেখলেই ভয়ে আঁতকে ওঠে।

এই গল্পটি সম্ভবত সত্যি নয়। তবে গোর্খা সৈনিকরা সত্যি ভয়ানক হিংস্র বলেই অমন মিথের জন্ম হয়েছিল।

গোর্খারা বাষট্টি সালে ভারতের হয়ে চিনের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করেছে। চিনের লালফৌজ তাদের উদ্দেশে আবেদন জানিয়েছিল, তোমরা তো গরিব লোক, ধনীদের হয়ে যুদ্ধ করতে এসেছ কেন? তোমরা ফিরে যাও। কিন্তু একজনও সেকথায় কান দেয়নি।

সেই যুদ্ধে ভারত সরকার গোর্খাদের উপযুক্ত রসদ এবং গোলাবারুদ দিতে পারেনি। প্রায় অপ্রস্তুত অবস্থায় তাদের দুর্গম হিমালয়ে লড়াই করতে পাঠিয়েছিল। কিন্তু ওই অবস্থাতেই গোর্খারা দুর্ধর্ষ চিনাদের সঙ্গে লড়াই করত এবং দলে দলে প্রাণ দিত।

গোর্খারা বলে, ভীরু হিসাবে বেঁচে থাকার চেয়ে সাহসীর মতো মৃত্যুবরণ করা ভালো। এদেশের প্রাক্তন সেনাপ্রধান স্যাম মানেকশ একবার বলেছিলেন, কেউ যদি বলে আমি মরতে ভয় পাই না, তা হলে সে হয় মিথ্যাবাদী না হলে গোর্খা।

আঠার ইঞ্চি লম্বা এক ছোরা গোর্খাদের নিত্যসঙ্গী। তাকে বলে কুকরি। তাদের জাতের রীতি হল, একবার খাপ থেকে কুকরি বার করলে তাকে রক্ত পান করাতেই হবে। শত্রুর রক্ত পান করাতে পারলে ভালো, না হলে অন্তত নিজের শরীরের কোথাও কেটে কুকরির তৃষ্ণা মিটিয়ে দিতে হবে। তার আগে অস্ত্রটাকে খাপে পোরা চলবে না।

গোর্খাদের আদি বাসস্থানে নেপালে। ওখানে গোর্খা নামে এক আদ্যিকালের শহর আছে। তা থেকে ওই অঞ্চলের বাসিন্দাদেরও নাম হয়ে গেছে গোর্খা। তাদের রাজা সতেরশ আশি সাল নাগাদ সিকিম, দার্জিলিং, শিলিগুড়ি হয়ে পশ্চিমে সিমলা, নৈনিতাল, গাড়োয়াল পাহাড়, কুমায়ুন পর্যন্ত দখল করেছিল। তখন থেকেই ওই সব জায়গায় গোর্খাদের বসতি গড়ে ওঠে।

আঠারশ পনের সালে ইংরেজরা নেপাল দখল করতে গেল। ইংরেজদের আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও উন্নত রণকৌশলের সঙ্গে গোর্খারা পেরে উঠল না। ইংরেজরা যুদ্ধে জিতে দার্জিলিং, সিকিম ও উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকা কেড়ে নিল গোর্খাদের হাত থেকে। দার্জিলিংকে তারা প্রথমে সিকিমের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিল। পরে প্রশাসনিক সুবিধার জন্য অবিভক্ত বাংলার রাজশাহী ডিভিশনের সঙ্গে জুড়ে দিল। এইভাবে ব্রিটিশদের দৌলতে দার্জিলিং নামে জায়গাটা ঢুকে পড়ল বাংলার মানচিত্রের মধ্যে।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে সাহেবরা ওখানে একের পর এক চা বাগান গড়ে তুলতে লাগল। তাদের আড়কাঠিরা সাঁওতাল পরগনা থেকে সরল আদিবাসীদের ভুলিয়ে ভালিয়ে চা বাগানে কাজ করাতে নিয়ে এল। চা শিল্পে কর্মসংস্থানের জন্য আরও নানা জনজাতির মানুষ ভিড় করল ওখানে। সমতলের গরম থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ব্রিটিশ রাজপুরুষরা পাহাড়ের বুকে গড়ে তুলল বিলিতি ছাঁদের বাংলো। তারপর কু ঝিক ঝিক করে এঁকেবেঁকে চলতে লাগল টয় ট্রেন। পাহাড়ের বুকে ঘুমিয়ে থাকা দার্জিলিং আধুনিক শিল্পের ছোঁয়াচ লেগে সরগরম হয়ে উঠল।

একটা কথা প্রচলিত আছে, দার্জিলিং নাকি শুরুতে ছিল লেপচাদের গ্রাম। অনেক পরে গোর্খারা সেখানে নেপাল থেকে এসেছে। সত্যজিৎ রায় তাঁর কাঞ্চনজঙ্ঘা সিনেমায় ছবি বিশ্বাসের মুখ দিয়েও ওই কথাটি বলিয়েছেন। একটা সিনে আছে, ছবি বিশ্বাস অভিনীত চরিত্রটি দার্জিলিংয়ের ম্যালে দাঁড়িয়ে বলছে, দার্জিলিং তো ছিল আদতে লেপচাদের একটা গ্রাম, পরে সাহেবরা নতুন করে জায়গাটাকে গড়ে তুললে।

আটের দশকে যখন গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন প্রথমবার দানা বাধে, তখন বামফ্রন্টের বুদ্ধিজীবীরাও ওই কথাটি বলত, গোর্খারা তো দার্জিলিংয়ে অনুপ্রবেশকারী, তারা আবার পৃথক রাজ্য চায় কী করে? জায়গাটা তো আসলে লেপচাদের বাসস্থান ছিল।

আরও পরেও এই ধরনের কথা শোনা গেছে। এখনও শোনা যায়। এই গুজবের উৎস কোথায়?

সেই উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ক্যাপটেন লিয়ড নামে এক ব্রিটিশ সৈনিক দার্জিলিংয়ে গিয়ে দেখতে পেয়েছিলেন, শ'খানেক লেপচা জনজাতির মানুষ কুটির বানিয়ে বসবাস করছে। তাই তিনি লিখলেন, দার্জিলিং আসলে লেপচাদের গ্রাম। তিনি যেকথা জানতেন না, তা হল, লেপচারা যাযাবর জনজাতি। তারা পাহাড়ের গায়ে ঝুম চাষ করে। এক জায়গায় বেশিদিন ঝুম চাষ করা যায় না। তাই তারা পাহাড়ের নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। কোথাও বেশিদিন থাকে না। ক্যাপটেন লিয়ড যখন দার্জিলিংয়ে গিয়েছিলেন, তখন ওখানে লেপচারা অস্থায়ী বসতি তৈরি করেছিল। তিনি যদি আর কিছুদিন বাদে দার্জিলিংয়ে যেতেন, তা হলে হয়তো লেপচাদের দেখতে পেতেন না।

এযুগে সরকারপক্ষের বুদ্ধিজীবীরা সাহেবদের সেই ভুলটাকেই মান্য করে চলেছেন। তাঁরাও সাহেবদের মতোই মনে করেন, গোর্খারা তো বহিরাগত। আমরা দয়া করে ওদের এদেশে থাকতে দিয়েছি। তার প্রতিদানে ওরা চিরকাল বিশ্বস্ত ভৃত্য হয়ে থাকবে। কখনও অবাধ্য হবে না। নিজেদের দাবিদাওয়ার কথাও তুলবে না।

গোর্খারা সত্যিই দু'শো বছর ধরে সাদা ও কালো সাহেবদের খুব বিশ্বস্তভাবে সেবা করেছিল। সেই ১৮১৫-র যুদ্ধের পর থেকে এই ব্যাপারটা শুরু হয়। সেবার তারা পরাজিত হয়েছিল বটে, কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ফৌজেরও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল ভীষণ। গোর্খাদের বীরত্ব দেখে

সেনাপতি ডেভিড অক্টারলোনি পর্যন্ত অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি ভাবলেন, আমরা যদি এই পাহাড়ি লোকগুলোকে ব্রিটিশ সেনাদলে নিয়োগ করি তা হলে কেমন হয়!

যেমন ভাবা তেমনি কাজ। সেই থেকে গোর্খাদের ব্রিটিশ সেনাদলে নিয়োগ করা শুরু হল। তখন গোর্খা রেজিমেন্টকে বলত নাসিরি রেজিমেন্ট। পরে তার নাম হয় কিং জর্জেস ওন গুর্খা রাইফেলস। ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহে গোর্খা রেজিমেন্ট ছিল ব্রিটিশদের বড় ভরসাস্থল। তারা বিদ্রোহী সেপাইদের দমন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। পরবর্তীকালে তারা ইংরেজের হয়ে শিখ ও আফগানদের সঙ্গেও যুদ্ধ করেছে এবং জয় ছিনিয়ে নিয়ে এসেছে।

বিংশ শতাব্দীতে দু'-দু'টো বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ প্রভুদের হয়ে অন্তত দু'লক্ষ গোর্খা লড়াই করেছিল। তাদের মধ্যে মারা গিয়েছিল প্রায় তেতাল্লিশ হাজার। সাহেবরা তাদের সবচেয়ে বিপজ্জনক যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাত।

ভারতীয় উপমহাদেশে ক্ষমতা হস্তান্তরের পরেও ব্রিটিশরা গোর্খাদের ছাড়তে চাইল না। এমন দক্ষ সেপাইদের হাতছাড়া করবে কোন আহাম্মক। তাই সাতচল্লিশ সালে ব্রিটেন, ভারত ও নেপালের মধ্যে চুক্তি হল, ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে গোর্খাদের নিয়োগ করা হবে। তারপর থেকে গত পঞ্চাশ বছরে গোর্খারা সাহেবদের হয়ে মালয়েশিয়া, বোর্নিও, সাইপ্রাস, ফকল্যান্ড, কসোভো, আফগানিস্তান ও ইরাকে লড়াই করেছে। এখনও আফগানিস্তান ও ইরাকে তারা রয়েছে এবং সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের সেবায় প্রাণ দিয়ে চলেছে।

ব্রিটিশ সরকার গোর্খাদের জোরে অনেক যুদ্ধ জয় করেছে বটে কিন্তু বেতন ও পেনশনের বেলায় তাদের ঠকাতে ছাড়েনি। বিলেতে কোনও শ্বেতাঙ্গ সৈনিককে যে বেতন ও পেনশন দেয়, গোর্খাদের দেয় তার চেয়ে অনেক কম। কেননা সাহেবদের কাছে গোর্খা সৈনিকের প্রাণ খুব সস্তা।

গোর্খারা বহুকাল যাবৎ সেই অনাচার সহ্য করেছিল। পাহাড়ি লোক তারা, পাহাড়ের মতোই অটল ধৈর্য তাদের। কিন্তু শেষ অবধি চুপ করে থাকতে পারেনি। বছর দশেক আগে তারা সমান পেনশনের দাবিতে রীতিমতো আন্দোলন করেছিল ব্রিটেনে।

গোর্খারা চায়, সাহেবরা তাদের জাতের বীরত্বের স্বীকৃতি দিক। তারা যে শ্বেতাঙ্গ সৈনিকদের চেয়ে কোনও অংশে কম নয়, এটুকু অন্তত স্বীকার করুক। সেইজন্যই শ্বেতাঙ্গদের সমান পেনশন দাবি।

একইভাবে গোর্খাদের আহত জাত্যভিমান থেকে এদেশেও গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের জন্ম হয়েছে। গোর্খারা ভাবছে, দার্জিলিং জেলাকে কেন্দ্র করে পৃথক রাজ্য গড়ে উঠলে ভারতে তাদের জাতের মর্যাদা রক্ষা পাবে।

গোর্খাদের পৃথক রাজ্যের দাবি আজকের নয়। একশ বছরের বেশি সময় ধরে তারা ওই দাবি জানিয়ে আসছে। মনে হয়, এই দেশের গোর্খারা বহুকাল যাবৎ মনের মধ্যে একটা দুঃখ পুষে রেখেছিল। তারা প্রাণ দিয়ে প্রভুদের সেবা করত ঠিকই কিন্তু তাতে তাদের দারিদ্র ঘোচেনি।

গোর্খারা ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম দরিদ্র জনজাতি। তারা ভাবত, আমাদের কেউ মানুষ বলে গণ্য করে না। কেবলই কম পয়সায় কাজ করিয়ে নেয়। কামানের খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করতে চায়।

তাদের ধারণা, নিজেদের একটা রাজ্য পেলে এমনতর বৈষম্য ঘুচবে। তাই গোর্খাদের প্রতিনিধিরা হাত উনিশশ সাত সালে মর্লে-মিন্টো রিফর্ম প্যানেলের সামনে জোড় করে আর্জি জানিয়েছিল, হুজুর আমাদের পৃথক রাজ্য চাই।

এই মর্লে-মিন্টো রিফর্ম প্যানেলটি ভারী ইন্টারেস্টিং ব্যাপার ছিল। উনিশশ পাঁচ সালে ভারতের ভাইসরয় লর্ড কার্জন যখন বাংলাকে দু'টুকরো করলেন তখন বাঙালি হিন্দু, বিশেষত উচ্চবর্ণরা তো খুব ক্ষেপে গেল। তাদের কবি 'বাংলার মাটি বাংলার জল' ইত্যাদি গান লিখলেন, সেই গান গেয়ে সবাই মিলে মুসলমানের হাতে রাখি পরিয়ে দিল, আজ থেকে আমরা সবাই ভাই ভাই। ছাত্ররা এতেই না থেমে বিলিতি বস্ত্র পোড়াতে লাগল, বিদ্বজ্জনেরা স্বদেশি শিল্প ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উদ্যোগ নিলেন, তখনকার দিনের সন্ধ্যা, যুগান্তর, হিতবাদী ইত্যাদি পত্রিকায় গরম গরম লেখা বেরতে লাগল এবং এইসব করে হইহট্টগোল-উত্তেজনা হল খুব।

কিন্তু ব্যাপারটা ওখানেই শেষ হয়ে গেল না। যে তরুণরা ব্রিটিশ শাসনের নানা অনাচারে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল তাদের একজন প্যারিসে গিয়ে বিস্ফোরক বানানোর কায়দাকানুন শিখে এল। তারপরে ক্ষুদিরামের বোমা, মুরারিপুকুর বোমার মামলা, ফাঁসি, দ্বীপান্তর ইত্যাদি ঘটতে লাগল। তখনকার দিনে সাহেবদের মধ্যে যারা কনজারভেটিভ ছিল, তারা বলত, বাঙালিদের ধরে বেদম ঠ্যাঙানি দাও, যাকে পার ফাঁসিতে ঝোলাও কিংবা পাঠিয়ে দাও আন্দামানে, তা হলেই বিপ্লবের ভূত ওদের ঘাড় থেকে নেমে যাবে। অন্যদিকে মডারেট সাহেবরা ভাবত, শুধু দমননীতি চালিয়ে বোমা ফাটা বন্ধ করা যাবে না। তার জন্য রিফর্ম চাই। ভারতীয়দের আইনসভায় আরও সুযোগ দেওয়া চাই। প্রত্যক্ষ নির্বাচন চালু করা চাই। তবে ওদের মাথা ঠান্ডা হবে।

অর্থাৎ লিবারেলরা হিন্দুস্তানে ভোটের রাজনীতি দিয়ে বোমার রাজনীতিকে ঠেকাতে চাইছিল।

এমন সময় দুই লিবারেল রাজনীতিক, জন মর্লে এবং লর্ড মিন্টোকে ব্রিটিশ সরকার দায়িত্ব দিল, আপনারা শিক্ষিত ভারতীয়দের বশ মানানোর জন্য কিছু একটা করুন। তাঁরা এদেশে সব পক্ষের কথা শুনে উনিশশ নয় সালে তৈরি করলেন ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট। তাতে বলা হয়েছিল, ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল ও প্রাদেশিক আইনসভায় আরও বেশি সংখ্যক ভারতীয় প্রতিনিধি থাকবেন, প্রাদেশিক আইনসভার জন্য প্রত্যক্ষ নির্বাচন করা হবে এবং মুসলমানদের আলাদা প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা থাকবে।

ওই সময় সরকার হিন্দু উচ্চবর্ণের বিপ্লবীদের ঠেকানোর জন্য মুসলমানদের দলে টানতে চাইছিল। তাই ওদের জন্য আইনসভায় পৃথক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করল। কিন্তু গোর্খাদের নিয়ে সরকারের কোনও মাথাব্যথা ছিল না। ওরা ভালো দারোয়ান হতে পারে, যুদ্ধ বাধলে প্রাণও দিতে পারে, কিন্তু আলাদা রাজ্য নিয়ে কী করবে এই ভেবে মর্লে-মিন্টো প্যানেল ওদের দাবিকে পাত্তাই দিল না।

আসলে প্রজারা হাত জোড় করে কিছু চাইলে শাসক কখনই সেই দাবি পূরণ করে না। এমনটাই নিয়ম। গোর্খাদের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

ক্ষমতা হস্তান্তরের পরে ফের গোর্খাদের পৃথক রাজ্যের কথা শোনা গেল উনিশশ বাহান্ন সালে। সেবার অল ইন্ডিয়া গোর্খা লিগ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর কাছে এক স্মারক লিপি দিয়ে দাবি করেছিল, গোর্খাদের পৃথক রাজ্য চাই। কিন্তু ভুতপূর্ব ইংরেজ শাসকদের

মতো নেহরুও তাদের পাত্তা দেননি।
১৯৫৫ সালে তারা পুনরায় স্টেট রি অর্গানাইজিং কমিটির কাছে দাবি করল, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি আর কোচবিহার জেলা নিয়ে আলাদা রাজ্য গড়া হোক, কিন্তু তাতেও কেউ কান দিল না।
একসময় সিপিআই গোর্খাদের প্রতি খুব সহানুভূতি দেখাত, আহা বেচারারা বড় গরিব, ওদের জন্য একটা কিছু ব্যবস্থা করা দরকার। সাতাত্তর সালে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে বিধানসভায় সর্বসম্মতিক্রমে এক প্রস্তাব পাশ হয়েছিল, দার্জিলিং ও সন্নিহিত এলাকায় স্বশাসিত পরিষদ গড়ে তোলা হবে।
কিন্তু ততদিনে গোর্খারা বুঝে গেছে, অনুরোধ-উপরোধ করলে কিছু আদায় হয় না। হাত মুঠো করে, চোখ লাল করে দাবি জানাতে হয়। সেইমতো তারা পৃথক রাজ্যের দাবিতে আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। সেই খবর পেয়েই জ্যোতি বসুর সরকার তড়িঘড়ি পাহাড়ে স্বশাসিত পরিষদ গঠনের উদ্যোগ নেয়। কিন্তু ওভাবে গোর্খাদের ঠেকানো যায়নি।
ওই সময় পাহাড়ে গোর্খাদের এক ক্যারিশমাটিক নেতা আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর নাম সুবাস ঘিসিং। ঊনিশশ ছত্রিশ সালে মিরিকের মাঞ্জু চা বাগানে তাঁর জন্ম। বাবা ছিলেন চা বাগানেরই 'গার্ডেন বাবু'। সুবাস তাঁর সপ্তম সন্তান। তিনি যখন ক্লাস নাইনে পড়েন, বাবা মারা গেলেন। অভাবে পড়াশোনা বন্ধ হয়ে গেল। অন্যান্য গোর্খা যুবকের মতো সুবাসও বেছে নিলেন সৈনিকের বৃত্তি। যোগ দিলেন ভারতের সেনাবাহিনীতে। সেখানেই ম্যাট্রিকুলেশন পাস করলেন। কিন্তু সেনাবাহিনীর ব্যাপার স্যাপার দেখে তাঁর চোখ খুলে গেল।
তরুণ সুবাস লক্ষ করেছিলেন, সেনাবাহিনীতে কেউ গোর্খাদের ভারতীয় বলে গণ্য করে না। সরকার ভাবে, আমরা দয়া করে নেপালিদের ইন্ডিয়ায় থাকতে দিয়েছি, আর্মিতে চাকরি দিয়েছি, ওরা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়ে সেই ঋণ শোধ করুক।
সুবাস দরিদ্র ছিলেন ঠিকই কিন্তু তাঁর আত্মসম্মানবোধ ছিল প্রখর। তিনি এইরকম বৈষম্যমূলক মনোভাব সইতে পারবেন কেন? রাগের মাথায় ছেড়েই দিলেন সেনাবাহিনীর চাকরি। মনে মনে ভাবতে লাগলেন, গোর্খাদের এই অপমান ঘোচানোর জন্য লড়াই করবেন, তাতে প্রাণ যায় সেও ভি আচ্ছা।
চাকরি তো ছাড়লেন, এখন খাবেন কী? কিছু একটা তো করতেই হবে। সেনাবাহিনীতে থাকতে সেই যে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেছিলেন, তার জোরেই চাকরি জুটে গেল তিনধারিয়া প্রাইমারি স্কুলে।
কিন্তু কোথাও বেশিদিন চাকরি করা সুবাসের ধাতে নেই। প্রাইমারি স্কুলে বছরখানেক পড়ানোর পরে তিনি চাকরি ছেড়ে ভর্তি হলেন কালিম্পংয়ের বিটি কলেজে। সেখানেও গোলমাল। সামান্য একটা বিষয়কে কেন্দ্র করে প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে ঝগড়া হল শেষ পর্যন্ত কলেজই ছেড়ে দিলেন।
তারপর ভর্তি হলেন দার্জিলিং গভর্নমেন্ট কলেজে। আর্টস নিয়ে বারো ক্লাস পাস করলেন। গ্র্যাজুয়েট হওয়ার জন্য ওই কলেজেই ভর্তি হলেন ফের। এইবার তাঁর সঙ্গে জীবনে প্রথমবার রাজনীতির যোগাযোগ ঘটল। তখন গোর্খাদের নানা দাবিদাওয়া নিয়ে কলেজের ছেলেরা আন্দোলন করছিল। তরুণ সুবাস হয়ে উঠলেন তাদের সহযোগী। ওই করতে গিয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষের বিষনজরে পড়লেন। সেকেন্ড ইয়ারে পড়ার সময় কলেজ থেকে বিদায় নিতে হল।
জীবনের নানা ওঠাপড়ার মধ্যে দিয়ে ততদিনে সুবাস বুঝে গেছেন, রাজনীতিই তাঁর ভবিতব্য। তাই আটষট্টি সালে পাহাড়ে তৈরি করলেন নিজের সংগঠন, নীলো ঝাণ্ডা। পাহাড়ি মানুষজনের নানা দাবিদাওয়ার কথা বলত ওই সংগঠন। কিন্তু বছর দশেক তাঁকে কেউ সিরিয়াসলি নেয়নি। তাঁর অনুগামীর সংখ্যা ছিল নগণ্য। তিনি একাই কাঁধে করে একটা নীল ঝাণ্ডা বয়ে বেড়াতেন আর চোঙা হাতে নিয়ে বাজারে বক্তৃতা দিতেন। সেই ভাষণ শুনে বেশিরভাগ লোক বিরক্ত হত। কয়েকবার নাকি কুকরি নিয়ে তাঁকে তাড়াও করেছিল। কিন্তু সুবাস অত সহজে দমে যাওয়ার পাত্র নন। এই অধ্যবসায়ের ফল ফলল সাতের দশকের শেষদিকে।
ওই সময় গোর্খাদের আশাহত হওয়ার মতো দু'টি ঘটনা ঘটে। প্রথমত কেন্দ্রে তৎকালীন জনতা পার্টি সরকারের কাছে নেপালি ভাষার সরকারি স্বীকৃতি দাবি করতে গিয়ে গোর্খা প্রতিনিধিরা রীতিমতো অপমানিত হন। দ্বিতীয়ত, উত্তর-পূর্ব ভারতে নেপালি খেদাও আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৭৭ সালে অখিল ভারতীয় নেপালি ভাষা সমিতি নামে এক সংগঠনের গুটিকতক প্রতিনিধি প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাইয়ের কাছে গিয়ে খুব বিনীতভাবে বললেন, স্যার, ভারতে পঞ্চাশ লক্ষ নেপালি ভাষাভাষী লোক বাস করেন। কিন্তু তাঁদের ভাষার কোনও স্বীকৃতি নেই। আপনি যদি দয়া করে নেপালি ভাষাকে সরকারি স্বীকৃতি দেন, তবে তারা ভারতের মূলস্রোতে যুক্ত হতে পারে।
সম্ভবত সেদিন কোনও কারণে আগে থেকে মোরারজির মেজাজ খারাপ হয়ে ছিল, তাই তিনি গোর্খা প্রতিনিধিদের কথা শুনে একেবারে তেড়ে গেলেন, যাও যাও তোমাদের নেপালের রাজার কাছে গিয়ে ওই দাবি জানাওগে যাও! আমার কাছে কেন?
গোর্খা প্রতিনিধিরা তাও বিনয়ের সঙ্গে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করেছিলেন, নেপালের সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই হুজুর। আমরা বহুকাল ধরে এই দেশে আছি হুজুর। আপনি যদি দয়া না করেন তো যাই কোথা! কিন্তু মোরারজি নরম হওয়ার পাত্র নন। তিনি আরও খিঁচিয়ে উঠে বললেন, তোমরা তো ইন্ডিয়ান আর্মিতে যোগ দেওয়ার জন্য নেপাল থেকে এসেছিলে। তারপর আমাদের দেশে দিব্যি বসবাস করছ। এখন আবার নিজেদের ভাষার জন্যও সরকারি স্বীকৃতি চাইছ। তোমাদের তো দেখছি চাহিদার শেষ নেই। এমনি করলে আর্মিতে গোর্খাদের চাকরি দেওয়াই বন্ধ করে দেব।
মোরারজি এমন অভদ্র ব্যবহার করেছেন শুনে গোর্খা তরুণরা রাগে ফুঁসতে লাগল।
এদিকে ততদিনে অসমে শুরু হয়েছে বহিরাগত খেদাও আন্দোলন। দাবি উঠেছে, অসম কেবল অসমিয়াদের জন্য। গোর্খারা দীর্ঘকাল ধরে অসম ও মেঘালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে বসবাস করত, চাষবাস করত, পশুপালন করত, বুনো হাতি আর শুয়োরের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকত। প্রায় আদিম মানুষের মতো জীবনযাত্রা ছিল তাদের। ভারতের নাগরিকত্বের কোনও পরিচয়পত্র তাদের কাছে ছিল না। এই সুযোগে তাদের বিদেশি বলে তাড়িয়ে দিতে লাগল।
এই খবর শুনে যুগপৎ ক্রুদ্ধ ও উদ্বিগ্ন হল গোর্খাদের ছেলে-বুড়ো সব্বাই। তাহলে কি ভারত থেকে তাদের এভাবেই বিদায় নিতে হবে?

এমন সময় ঘিসিং নতুন দাবি তুললেন, গোর্খাল্যান্ড চাই। গোর্খাদের নিজস্ব হোমল্যান্ড চাই। তবে এই অবমাননার অবসান হবে। এতদিন বাদে পাহাড়বাসী তাঁর ডাকে এককথায় সাড়া দিল। তিনি হয়ে উঠলেন পাহাড়ের অবিসংবাদী নেতা।

এইভাবে আটের দশকে শুরু হল গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন। পাহাড়বাসীরা একযোগে বলল, স্বশাসন নয়, নিজেদের রাজ্য চাই। এই আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠল আটের দশকের মাঝামাঝি।

আগেই বলেছি, আন্দোলনের শুরুতেই বামফ্রন্ট সরকার স্বশাসনের নাম করে গোর্খাদের ঠান্ডা করতে চেয়েছিল। কিন্তু তা যখন হল না, তখন চিরাচরিত পথে, লাঠি-গুলি দিয়ে গণ আন্দোলনকে দমন করতে চাইল। জ্যোতি বসুর সরকার পুলিশ-সিআরপিকে ফ্রি হ্যান্ড দিল, যত পার খুন-খারাপি কর, ওদের মাজা ভেঙে দাও একেবারে।

সেবারের আন্দোলনে সবচেয়ে কুখ্যাত গণহত্যা হয়েছিল '৮৬ সালের ২৭ জুলাই। সিআরপি জওয়ানরা কালিম্পংয়ে সমবেত গোর্খা নারী-পুরুষদের উদ্দেশে গুলি চালিয়ে হত্যা করেছিল তের জনকে। পাহাড়বাসীরা ওই ঘটনাকে জালিয়ানওয়ালাবাগের সঙ্গে তুলনা করেন। আটের দশকের আন্দোলনে ১২০০ পাহাড়বাসী শহিদ হয়েছিলেন।

এত আত্মত্যাগের পরেও গোর্খাল্যান্ড অধরা রয়ে গেল। অষ্টআশি সালে সুবাস পাহাড়ে স্বশাসিত পরিষদ গঠনে রাজি হয়ে গেলেন। অর্থাৎ দু'বছর ধরে হিংসাত্মক আন্দোলন, রক্তপাত, লোকক্ষয় ও সম্পত্তিহানির পরে তিনি গোর্খাল্যান্ডের দাবি পরিত্যাগ করলেন। সেই একাশি সালে বামফ্রন্ট গোর্খাদের যেটুকু স্বশাসন দিতে চেয়েছিল, এত কিছুর পরে কার্যত ওইটুকু নিয়েই সন্তুষ্ট রইলেন সুবাস।

গোর্খা চুক্তি স্বাক্ষর উপলক্ষে অষ্টআশির বাইশে আগস্ট বেলা দশটা থেকে রাজভবনের ব্যাংকোয়েট হলে দেদার খানাপিনা হয়েছিল। সেখানে জ্যোতি বসু ছিলেন, কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বুটা সিং ছিলেন, রাজ্যের চিফ সেক্রেটারি, কেন্দ্রের হোম সেক্রেটারি এবং আরও সব বড় বড় আমির-ওমরাহরা ছিলেন, সবাই মিলে খুব আমোদ করলেন এবং তার মধ্যে দিয়ে দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিলের জন্ম হল। সুবাস হলেন তার প্রধান। পশ্চিমবঙ্গের একজন পূর্ণমন্ত্রীর তুল্য পদমর্যাদা, বেতন ও অন্যান্য সুবিধা তাঁর প্রাপ্য হল।

তারপরে তো ঘিসিং পাহাড়ে হয়ে উঠলেন নবাব। ডিজিএইচসি-র টাকা দেদার ওড়াতে লাগলেন। বেচারা গরিবের ছেলে, জীবনে কখনও শখ মেটানোর সুযোগ পাননি, এখন মধ্যবয়সে হাতে প্রভুত ক্ষমতা ও অর্থ পেয়ে মাথা ঠিক রাখতে পারলেন না।

পাহাড়বাসীরা প্রথমে বুঝতে পারেনি তারা নাকের বদলে নরুণ পেয়েছে। আসলে দীর্ঘকাল যাবৎ যত বজ্জাত লোকেদের সেবা করে করে তাদের চেতনা ভোঁতা হয়ে গিয়েছিল, তাই নিজেদের ভালোমন্দ সহজে বুঝতে পারত না।

তা বলে চিরকাল গোর্খাদের বোকা বানিয়ে রাখা সম্ভব হল না। পাহাড়ে ক্রমশ সুবাসের জনপ্রিয়তা কমতে লাগল। এই সুযোগে মাথা তুললেন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী, তাঁর নাম বিমল গুরুং। তিনিও সুবাসের মতো গরম গরম ভাষণ দেন। তাঁর একটা স্বভাব হল, কখনও পায়ে জুতো পরে ভাষণ দেন না, মঞ্চে ওঠার আগেই জুতো খুলে ফেলেন। তারপর মাতা ধরিত্রীকে প্রণাম করেন। তাঁর ঘনিষ্ঠজনেরা বলেন, বিমলের বক্তৃতা দেওয়ার স্টাইল অনেকটা জর্জ বুশের মতো।

এই বিমল কিন্তু সুবাসের চেয়েও গরিব ঘরের ছেলে। ঊনিশশ চৌষট্টি সালে এক চা শ্রমিকের পরিবারে তাঁর জন্ম। স্কুল-কলেজে লেখাপড়ার সুযোগ পাননি। খুব ছোট থেকেই রোজগারের ধান্ধায় বেরতে হয়েছিল।

ছিয়াশিতে গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন শুরু হতে বদলে গেল তাঁর জীবন। আরও অনেক সমবয়সী ছেলের মতো তিনিও যুক্ত হলেন মিছিল-মিটিং-ধর্নায়। তখন তিনি সুবাস ঘিসিংয়ের জঙ্গি ক্যাডার। জিএনএলএফের যুব সংগঠন গোর্খা ভলান্টিয়ার সেলের উৎসাহী সদস্য।

কিন্তু হিল কাউন্সিল তৈরি হতে তাঁর স্বপ্নভঙ্গ হল। কোথায় গোর্খাল্যান্ড? সুবাস ঘিসিং তো দিব্যি পোষ মেনে গেছেন। সেই রাগে ছেড়েই দিলেন জিএনএলএফ।

তরুণ বিমল তারপর ঘিসিংয়ের পদাংক অনুসরণ করে একাই পাহাড়ি যুবকদের সংগঠিত করতে চাইলেন। সেইমতো বিরানব্বই সালে বেকার গোর্খা যুবকদের নিয়ে গড়ে তুললেন এক সংগঠন। নিরানব্বই সালে ডিজিএইচসি-র উপনির্বাচনে সুবাসের প্রার্থীকে হারিয়েও দিলেন। ব্যাপার স্যাপার দেখে সুবাস বুঝলেন, পাহাড়ে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী এসে গেছে। আগেভাগে তাকে বশ মানানোর জন্য খুব মিষ্টি করে বললেন, ভাই বিমল, তুমি আমার জিএনএলএফে যোগ দাও, তোমাকে বড় পোস্ট দেব।

সেইমতো বিমল পুনরায় জিএনএলএফে যোগ দিলেন। তাঁকে যুবকল্যাণ দপ্তরের দায়িত্ব দেওয়া হল।

বিমল বরাবরই উদ্যোগী পুরুষ। তিনি যুবকল্যাণ দপ্তরের দায়িত্ব পেয়ে গোর্খা যুবকদের খেলাধুলোয় উৎসাহ দিতে লাগলেন, মদ ও অন্যান্য মাদক ছাড়ানোর উদ্যোগ নিলেন এবং এই করে দারুণ পপুলার হয়ে উঠলেন পাহাড়ের মানুষের কাছে।

এর মধ্যে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার চুপ করে বসে থাকেনি। তলে তলে ষড়যন্ত্র করছিল যাতে গোর্খারা আর কখনও মাথা তুলতে না পারে। সেইমতো তারা দু'হাজার পাঁচ সালের শেষে ঘিসিংয়ের সঙ্গে চুক্তি করল, পাহাড়কে সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিলের আওতায় আনা হবে। আমরা ধরে নেব, এর ফলে পাহাড়ের যাবতীয় সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে গেছে এবং ভবিষ্যতে ওসব নিয়ে আর কোনও কথা শুনব না।

কাকে বলে ষষ্ঠ তফসিল?

একদা অসম, মেঘালয়, ত্রিপুরা ও মিজোরামের আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলের জন্য ষষ্ঠ তফসিল চালু হয়েছিল। নিয়ম মতো সরকার ষষ্ঠ তফসিলের আওতাধীন এলাকায় একটি স্বশাসিত পরিষদ গঠন করে। সেই পরিষদের হাতে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জন্য আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা থাকে। সরকার দার্জিলিং পাহাড়েও ওইরকম স্বশাসিত পরিষদ গঠন করতে চাইছিল।

কিন্তু গোর্খারা ওই উদ্যোগকে দেখল সন্দেহের চোখে। কারণ তারা খেয়াল করেছিল, পাহাড়ে লেপচা, ভুটিয়া ও অপর কয়েকটি জনজাতির সঙ্গে গোর্খাদের একটি অংশকেও আদিবাসী বলে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে।

এরপর দার্জিলিং পাহাড়ে ষষ্ঠ তফসিল কার্যকরী হলে গোর্খাদের যে অংশটি আদিবাসী বলে চিহ্নিত হয়েছে তারা গোর্খা জাতির অপরাপর অংশের থেকে বেশি সুযোগ-সুবিধা লাভ করবে। এর ফলে গোর্খাদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি হবে।

পাহাড়ের লোকজন একথা বুঝতে পেরে ঘিসিংয়ের ওপরে বেজায় চটে গেল। তিনি কেন ষষ্ঠ তফসিল মেনে নিলেন? এ তো গোর্খা জাতিকে

হীনবল করে ফেলার চক্রান্ত!
এই সময় ইন্ডিয়ান আইডল নামে এক সর্বভারতীয় সংগীত প্রতিযোগিতায় জনৈক গোর্খা যুবক ফাইনাল রাউন্ডে উঠেছিল। তার নাম প্রশান্ত তামাং। ছেলেটি পেশায় কলকাতা পুলিশের কনস্টেবল। সে লারেলাপ্পা গান ভালো গাইত, অর্কেস্ট্রার সঙ্গে প্র্যাকটিস করত দিনভর, কখন পুলিশের ডিউটি করত কে জানে। গোর্খা জাতির ভালমন্দ নিয়ে তার কোনও ভাবনা ছিল বলে মনে হয় না।
কিন্তু বিমল গুরুং তাকেই গোর্খা ভাবাবেগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করলেন। ইন্ডিয়ান আইডল শোয়ের নিয়ম ছিল, শ্রোতারা এসএমএসে ভোট দিয়ে নির্ধারণ করবে কে বিজয়ী। গুরুং গোর্খাদের মধ্যে জোর প্রচার করতে লাগলেন, আপনারা জোট বেঁধে প্রশান্তের জন্য ভোট দিন। সরকার ষষ্ঠ তফসিল লাগু করে গোর্খাদের মধ্যে বিভাজন আনার চেষ্টা করছিল কিন্তু প্রশান্ত তামাংকে সামনে রেখে বিমল গুরুং তাদের ঐক্যবদ্ধ করার উদ্যোগ নিলেন।
এইরকম আপাততুচ্ছ একটি বিষয় নিয়ে সত্যি সত্যি গোর্খা ভাবাবেগ পুনরায় জমাট বেঁধে উঠল। তখন দু'হাজার সাত সাল। নন্দীগ্রামের চাষিরা সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করেছেন। বুদ্ধ-বিমান-শ্যামল প্রমুখেরা নাজেহাল, অপদস্থ। তাঁরা পুলিশের ড্রেস পরা হার্মাদদের পাঠাচ্ছিলেন চাষিদের খুন করতে কিন্তু সেই বীরপুঙ্গবরাই উল্টে মার খেয়ে পালিয়ে আসছিল। এমন সময় পাহাড়বাসীরাও হুংকার দিয়ে উঠল, হামারা মাঙ, গোর্খাল্যান্ড। পাহাড়ে সবাই বলতে লাগল, আমরা সুবাস ঘিসিংকে চাই না, হিল কাউন্সিল চাই না, উই ওয়ান্ট গোর্খাল্যান্ড। আন্দোলন জঙ্গি রূপ ধারণ করতে বৃদ্ধ সুবাস তল্পিতল্পা গুটিয়ে পাহাড় ছেড়ে সমতলে আশ্রয় নিলেন।
ততদিনে সিপিএমের বিদায় নেওয়ার সময় হয়ে এসেছে। তাই তারা পাহাড় সমস্যা সামলাতে পারল না। দু'হাজার এগারয় মমতা ভোটে জেতার পরে গুরুংয়ের সঙ্গে চুক্তি করলেন। তারপরে তৈরি হল গোর্খা টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনস্ট্রেশন। সে ছিল এক আধা স্বশাসিত পরিষদ। তার মাথায় বসলেন বিমল গুরুং। গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন তখনকার মতো মুলতুবি রইল।
বড়লোকেরা যেভাবে গুন্ডা পোষে, ঠিক সেই কায়দায় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার পাহাড়ে সুবাস ঘিসিংকে পুষেছিল। তিনি দীর্ঘ দুই দশক যাবৎ গোর্খাদের ঠান্ডা রেখেছিলেন। আলাদা গোর্খাল্যান্ডের দাবি তুলতে দেননি। কেউ ওসব কথা বললে হয় ভয় দেখিয়েছেন, নয়তো বাবা-বাছা বলে বশ মানিয়েছেন। কিন্তু সব স্ট্রংম্যানেরই একদিন না একদিন পতন হয়। ঘিসিংয়েরও হয়েছিল। তারপর সরকার দেখল, পাহাড়ে নতুন নেতা উঠেছে, বিমল গুরুং। দিল্লি ও কলকাতার ব্যুরোক্র্যাটরা ঠিক করলেন, ওকেই এবার পোষ্য নেওয়া যাক। সেইমতো জিটিএ বানিয়ে গুরুংকে তার মাথায় বসিয়ে দিলেন।
কিন্তু পাহাড়বাসী এবার আর বেশিদিন চুপ করে রইল না।
দু'হাজার বারো সালে আনুষ্ঠানিকভাবে তৈরি হয়েছিল জিটিএ। তার বছরখানেক বাদে অন্ধ্রপ্রদেশ ভেঙে তেলেঙ্গানা রাজ্য গঠনের প্রস্তাব পাস হল। অমনি আরও একবার ফুঁসে উঠল পাহাড়, ওরা যদি তেলেঙ্গানা পেতে পারে তো আমরা গোর্খাল্যান্ড পাব না কেন? গুরুং ঘোষণা করলেন জিটিএ একটা ধোঁকাবাজি ছাড়া কিছু নয় এবং ওই সংস্থা থেকে পদত্যাগ করলেন। পাহাড়ে বন্‌ধ শুরু হল। রাজ্য সরকার আধা সেনা পাঠিয়ে গোর্খাদের ঠান্ডা করতে চেয়েছিল কিন্তু তাতে লাভ হয়নি।
ইতিমধ্যে মমতার সরকারও সিপিএমের মতোই পাহাড়বাসীদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। এবারকার কায়দা ছিল একটু আলাদা। মমতা প্রথমে লেপচাদের নিয়ে পৃথক উন্নয়ন বোর্ড গঠন করলেন। তারপর ঘোষণা করলেন, পাহাড়ের অন্যান্য জনজাতির জন্যও পৃথক বোর্ড গঠন করবেন।
সেই শুনে সবাই বুঝল, গোর্খা বাদে পাহাড়ের অন্যান্য জনজাতি যাতে রাজ্য সরকারের অনুগত হয়ে থাকে, তার বন্দোবস্ত হচ্ছে। সেজন্য মমতা কৌশল করে তাদের জন্য বোর্ড বানাচ্ছেন। রাজ্য সরকার উন্নয়নের নামে ওই সব বোর্ডকে অনেক টাকা দেবে। জনজাতির নেতারা সেসব আত্মসাৎ করবেন এবং মমতার গুণ গাইবেন। তাঁদের অনুগামীরা গোর্খাল্যান্ডের বিরোধিতা করবে।
এখানেই শেষ নয়। পাহাড়ে গোর্খাদেরও কাউকে কাউকে লোভ দেখিয়ে তৃণমূলে ভেড়ানো শুরু হয়েছিল। এইভাবে দু'হাজার ষোলর বিধানসভা ভোটে দেখা গেল, পাহাড়ে মমতার ভোট বেশ বেড়েছে। তারপর একসময় মিরিক পুরসভা জিতেও নিল তৃণমূল।
এসব দেখে তো গুরুং ও তাঁর অনুগামীরা রাজ্য সরকারের ওপরে মর্মান্তিক ক্ষেপে ছিলেন। এমন সময় মমতা ঘোষণা করলেন, রাজ্যের সব স্কুলে ক্লাস টেন পর্যন্ত বাংলা পড়ানো বাধ্যতামূলক করা হবে। তখন আগুনে ঘৃতাহুতি হল। পাহাড়ের নেপালি ভাষাভাষী জনতা মনে করল, মমতা তাদের সংস্কৃতিকে ধ্বংস করতে চাইছেন। তাই বাংলা চাপিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র। পাহাড়ে পুনরায় অভ্যুত্থানের মতো পরিস্থিতি দেখা দিল। বন্‌ধে স্তব্ধ হয়ে গেল দার্জিলিং।
রাজ্যের শাসকদল বলছে, বিমল গুরুং জিটিএ-র অনেক টাকা সরিয়েছিল। এখন আমরা ধরে ফেলতেই ব্যাটা গোর্খাল্যান্ডের নামে পাহাড়ের লোককে ক্ষেপিয়ে তুলেছে ফের।
বিমল গুরুং সত্যিই চোর না সাধুপুরুষ, আমরা জানি না। কিন্তু আমরা জানি, কারও উস্কানিতে নয়, গোর্খা জনগণ ন্যায় ও সমানাধিকারের দাবিতে আন্দোলন করছেন। শাসকরা সবসময়ই বিরোধীদের নামে অমনি গাল দেয়, চুরির অপবাদ দেয়, আরও নানা খারাপ খারাপ কথা বলে। ওসবে কান দিতে নেই।

৩

গোর্খাদের আন্দোলন সরেজমিনে দেখার জন্য আমরা কলকাতা থেকে গিয়েছিলাম মোট ছ'জন। এপিডিআরের সাধারণ সম্পাদক ধীরাজ সেনগুপ্ত, উত্তরপাড়ার রাংতা মুন্সি, বেলেঘাটার শ্যামবাবু, ডায়মন্ডহারবারের আলতাফ এবং আমি। আর ছিল ফটোগ্রাফার সন্দীপ সাহা, যে আমাদের সঙ্গে কাশ্মীরে গিয়েছিল।
ট্রেন দু'ঘণ্টা লেট। উনিশ তারিখে বেলা বারোটায় এনজিপিতে নামলাম। সেখান থেকে টোটোয় চড়ে আধ ঘণ্টার যাত্রা, গন্তব্য শিলিগুড়ির

এপিডিআর অফিস। জায়গাটার নাম কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম মোড়। বেশ জমজমাট জায়গা, অনেক দোকান আছে, উল্টোদিকে লিবারেশনের পার্টি অফিস, ওখানে প্রায়ই আসেন চারু মজুমদারের ছেলে অভিজিৎ মজুমদার।
এই মোড়ে একটা ভারী ভালো চায়ের দোকান আছে, চা পাতা আর বানানো চা দু'ই-ই বিক্রি হয়। ওদের চা খেয়ে খুব ভালো লাগল, তাই ভাবলাম, খানিক চা পাতাও কিনে বাড়ি নিয়ে যাই। দুপুরে শিলিগুড়ি এপিডিআরের বন্ধুরা ভাত খাওয়ালেন। স্নান-খাওয়া সারতে বেশ বেলা হয়ে গেল, ওইদিন আর পাহাড়ে যাওয়া যাবে না। পরদিন শুরু হবে যাত্রা। আমাদের নিয়ে যাবেন অরুণ ঘাটানি নামে এক স্থানীয় ভদ্রলোক। তিনি কমিউনিস্ট পার্টি অব রেভলিউশনারি মার্কসিস্ট নামে এক পার্টির সদস্য। ছিয়ানব্বই সালে সিপিএম থেকে বেরিয়ে পাহাড়ের কয়েকজন ক্যাডার ওই দলটি গঠন করে।
অরুণবাবুরা গোর্খাল্যান্ডের সমর্থক। তাঁর একটা মারুতি এইট হান্ড্রেড গাড়ি আছে। তাতে চড়ে আমরা পাহাড়ে যাব। কিন্তু মুশকিল হল, একটা মারুতি গাড়িতে চড়ে তো অতজনের যাওয়া হবে না।
নতুন জায়গায় এসে খানিক ধাতস্থ হওয়ার পরেই টের পাচ্ছি, গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের উত্তাপে শিলিগুড়ি শহরটাও বেশ গরম হয়ে আছে। পথে একটা ট্রেকার দেখছি, তার গায়ে ফেস্টুন আটকানো, বাংলা ভাগের চক্রান্তের বিরুদ্ধে ঊনিশে জুলাই শিলিগুড়ি চলুন। ট্রেকারের ওপরে দু'টো চোঙা আটকানো, তাতেও চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে সবাইকে মিছিলে আসতে আহ্বান জানাচ্ছে। ফেস্টুনে সংগঠনের নাম লেখা, আমরা বাঙালি। আগে আমাদের হাওড়া-কলকাতাতেও ওই সংগঠনের দেওয়াল লিখন দেখতাম, বহুকাল আর দেখি না।
দুপুর নাগাদ ওদের মিছিল বেরল। বেশ লোক হয়েছে, হাজারখানেক তো হবেই। ছেলে-বুড়ো সবাই আছে, মেয়েরাও আছে, তাদের হাতে সবুজ পতাকা, তাতে শিকলপরা দু'টি হাতের ছবি আঁকা। পোস্টারও আছে, তাতে লেখা রাষ্ট্রদ্রোহী, সন্ত্রাসবাদী বিমল গুরুং, রোশন গিরিকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে। অনেকে মিলে একটা বড় ব্যানার ধরে নিয়ে যাচ্ছে, তাতে লেখা, অবিলম্বে জিটিএ চুক্তি বাতিল করতে হবে। মাঝে একবার মিছিল থামিয়ে একটা পথনাটিকা হল। দু'টি ছেলেকে কালো ড্রেস পরিয়ে গোর্খা নেতা সাজিয়েছে, তাদের লাঠি দিয়ে বেদম ঠ্যাঙানোর ভঙ্গি করতে লাগল কয়েকজন। বিমল গুরুংদের শাস্তি দেওয়ার নাটক। এইসব করে মিছিল বেশ জমে উঠেছে। বিকালে ওদের সভাও হল।
স্থানীয় এপিডিআরের বন্ধুরা বলছিলেন, তৃণমূলই আমরা বাঙালির মিছিলে লোক পাঠিয়েছে। নইলে এত লোক এল কোথা থেকে। আমার মনে হল, হতেও পারে, গোর্খাদের বিরুদ্ধে বাঙালি সেন্টিমেন্ট উসকে দেওয়ার জন্য তৃণমূল আমরা বাঙালির মিছিলে লোক পাঠালে আশ্চর্যের কিছু নেই।
কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের গেস্ট হাউসে আমাদের রাতে থাকার ব্যবস্থা। কলকাতা থেকে হিউম্যান রাইটসের লোকেরা এসেছে শুনে সন্ধেয় আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এল দুই গোর্খা তরুণী। ভারী ফুটফুটে হাসিখুশি চেহারা তাদের, আধুনিক পোশাক পরা। তারা স্থানীয় কলেজের ছাত্রী, গোর্খাল্যান্ডের জোর সমর্থক। রাংতার সঙ্গে ওইসব নিয়ে কথা বলতে লাগল।

২০ জুলাই। রোদ ঝলমলে সকাল।

কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম থেকে টোটোয় চড়ে দার্জিলিং মোড়ে এলাম। সেখানে দেখি অরুণ ঘাটানি তাঁর মারুতি এইট হান্ড্রেড নিয়ে অপেক্ষা করছেন। একটা টাটা সুমোও আছে। দু'টো গাড়িতে চেপে আমাদের তথ্যানুসন্ধানী দল সোনাদা শহর পর্যন্ত যাবে একসঙ্গে। তারপর দু'টো ভাগে ভাগ হয়ে চলে যাবে দু'দিকে। ধীরাজদা, রাংতা, সন্দীপরা যাবে দার্জিলিংয়ে। আমি, জয়গোপালদা, আলতাফ, শ্যামবাবু যাব বিজনবাড়িতে। সুমন গোস্বামী নামে আর একজনও যাবে। সে আলিপুরদুয়ার থেকে এসেছে। আমরা শুনেছি বিজনবাড়িতে আন্দোলন বেশ তেজি, শহিদ হচ্ছেন অনেকে। তাই স্থির হয়েছে, দার্জিলিংয়ের পাশাপাশি বিজনবাড়ি জায়গাটাও একবার ঘুরে আসা দরকার।
ধীরাজদারা অরুণ ঘাটানির মারুতিতে উঠলেন, আমরা টাটা সুমোয়। আমাদের সঙ্গে ছিল স্থানীয় গাইড। সে পাহাড়ের অনেককে চেনে। তাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে।
শিলিগুড়ি থেকে ঘণ্টাখানেকের পথ অতিক্রম করার পরে টের পেলাম, ক্রমশ ভূপ্রকৃতি বদলে যাচ্ছে। সমতলের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে আমরা পাহাড়ে পৌঁছে গেছি। চড়াই-উৎরাই ভেঙে এগোতে হচ্ছে।
শিলিগুড়ি থেকে ঘুম, আমরা অনেক উঁচুতে উঠে এলাম। এই জায়গাটা সমুদ্রপৃষ্ঠের চেয়ে সাত হাজার চারশ সাত ফুট উঁচুতে অবস্থিত। এখান দিয়ে টয় ট্রেনের লাইন গেছে। সেই লাইনের পাশ দিয়ে চলল গাড়ি। এখন বেশ বেলা হয়েছে। আবহাওয়ার মেজাজ-মর্জিও অন্যরকম। আকাশ জুড়ে ছেয়ে আছে বাদল মেঘ। ঝিরঝিরে বৃষ্টিও নেমেছে, তাতে দূরের পর্বতশ্রেণি, গাছপালা সব ঝাপসা। কোথাও কোথাও রাস্তার ওপর দিয়ে তিরতির করে বয়ে চলেছে পাহাড়ি ঝরনা। এই বর্ষার জল পেয়ে তারা ফুলে ফেঁপে উঠেছে।
ঘুম পেরিয়ে কালিম্পং। রাস্তায় যেতে যেতে লক্ষ করছি, পাহাড় যেন থম মেরে আছে। সব জায়গায় দোকান-পাট বন্ধ, রাস্তায় ইতিউতি একটা দু'টো লোক, কালিম্পং স্টেশনের গায়ে জংলা পোশাক পরা আধা সেনার ক্যাম্প। মাঝে মাঝে আচমকা মিছিলের সঙ্গে দেখা হয়ে যাচ্ছে। লোকজনের হাতে হলুদ-সবুজ পতাকা, তাতে বিমল গুরুংয়ের ছবি সাঁটা, স্লোগান দিচ্ছে হামারা মাঙ গোর্খাল্যান্ড, বিমল গুরুং জিন্দাবাদ। মেয়েরাও ভালো সংখ্যায় উপস্থিত। ওই নিস্তব্ধতার রাজত্বে এমনতর মিছিলেই পাহাড়ের প্রাণশক্তির আভাস মেলে।
কালিম্পং থেকে সোনাদা। সেখানে আমাদের দু'টো গাড়ি থামল। বড় রাস্তার ধারেই এক টিনের বাড়ি, ওখানকার একটা ছেলে শহিদ হয়েছে। বাড়ির ভেতরটা আধো অন্ধকার। আমাদের সঙ্গে এক মাঝবয়সী মহিলা সাক্ষাৎ করলেন, তিনি শহিদের মা। তাঁর ছেলের নাম ছিল তাসি ভুটিয়া।
কীভাবে মারা গেল?
তিনি বললেন, মিছিলে গিয়েছিল, পুলিশ গুলি চালিয়েছে। স্যামসুংয়ের মোবাইলে ছেলের ছবি দেখালেন, দিব্যি সুন্দর হাসিখুশি তরুণ, জিনস

আর হলুদ জ্যাকেট পরা। দেওয়ালে তার আরও একটা ছবি টাঙানো, সাদা কালো ছবি, তার ফ্রেমের গায়ে নকশা করা হলুদ রেশমী কাপড় লাগিয়েছে। এখানে হয়তো ওইভাবে মৃতদের শ্রদ্ধা জানায়। আমরা এসেছি শুনে পরিবারের আরও কয়েকজন উপস্থিত হয়েছিল। কিন্তু বেশি কথা হয়নি। ছেলে হারানোর শোকে থমকে আছে সবাই।

জয়গোপালদারা কয়েকজন খানিক দূরে আর একটা বাড়িতে গিয়েছিলেন। এক সত্তরোর্ধ্ব বৃদ্ধার সঙ্গে দেখা করে এলেন। তাঁর স্বামী গোর্খা রেজিমেন্টে কাজ করতেন। তাঁকে পুলিশে গৃহবন্দি করে রেখেছে।

তিনি কী করেছিলেন?

সেই বৃদ্ধা জয়গোপালদাদের বলেছেন, কিছুদিন আগে যখন পাহাড়ে আর্মির লোকজন টহল দিচ্ছিল আমি তাদের রুটি, কলা, দুধ খাইয়েছিলাম। তাই আমাকে পুলিশে ধরল।

কিন্তু বৃদ্ধা তো মিলিটারিকে লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়েননি। তাদের দুধ-কলা দিয়ে আপ্যায়ন করেছিলেন। তাতে অপরাধটা কী হল?

বৃদ্ধা জানিয়েছেন, পুলিশ ভেবেছিল, আমি মিলিটারিকে প্রভাবিত করতে চাইছি। মিলিটারি যাতে গোর্খাদের মারপিট, ধরপাকড় না করে সেজন্য দুধ-কলা দিয়ে তাদের বশ মানাতে চাইছি।

পুলিশ বৃদ্ধার নামে মামলা করেছে। তাঁর ঘর থেকে বেরনো বারণ। বেরলেই সোজা থানা হাজতে চালান করে দেবে। তার পরে তিনি আর শান্তিতে মরার সুযোগটুকুও পাবেন না। কোর্টে মামলার শুনানি না হওয়া পর্যন্ত ওইভাবে গৃহবন্দি থাকতে হবে। তিনি হিউম্যান রাইটসের লোকজনের সঙ্গে কথা বলেছেন শুনলেও পুলিশ ঝামেলা করতে পারে। সেজন্য বৃদ্ধা জয়গোপালদাদের বলেছেন, তোমরা যেন কোথাও আমার নাম লিখো না, ছবিও তুলো না।

সোনাদা থেকে ধীরাজদারা দার্জিলিংয়ের উদ্দেশে রওনা হলেন। আমরা চললাম বিজনবাড়ির দিকে।

ফের ঝাউগাছ আর শালবনের মধ্যে দিয়ে পথ, তার ওপর দিয়ে কোথাও কোথাও বইছে সরু জলস্রোত। অন্য সময় পাহাড়ে এলে এইরকম পথের ধারে কতরকম ফুল ফুটে থাকতে দেখা যায়, কিন্তু এই বর্ষায় তারা নেই। এখন ফুল ফোটার মরশুম নয়।

এই পথেও গুটিকতক মিছিল পড়ল। সব মিছিলের স্লোগান একই, হামারা মাঙ, গোর্খাল্যান্ড, বিমল গুরুং জিন্দাবাদ। এক জায়গায় দেখি, ছেলেরা সাদা গেঞ্জি পরে মিছিল করছে, গেঞ্জির গায়ে লেখা উই ওয়ান্ট গোর্খাল্যান্ড। মেয়েরাও ভালো সংখ্যায় মিছিলে শামিল। আমি বরাবরই দেখেছি, গোর্খা মেয়েরা খুব সেজেগুজে মিছিলে আসে। এই আন্দোলন কি ওদের কাছে ফেস্টিভ্যালের মতো?

বিকেল নাগাদ গাইড আমাদের পৌঁছে দিল বিজনবাড়ি শহরে। ওখানে আরও একজন গাইড আমাদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর নাম জে কে। হাসিখুশি মাঝবয়সী মানুষ। এখানকার সবাইকে চেনেন। আমাদের সঙ্গে লোকজনের আলাপ করিয়ে দেবেন।

জে কে প্রথমে আমাদের এক হোটেলে নিয়ে গেলেন। আমরা ছাড়া আর কোনও বোর্ডার নেই। দোতলায় একটা ঘর খুলে দিল, টিউবলাইট, পাখা আছে। অনেকগুলো বেড পর পর সাজানো। আলতাফ একবার বাইরে ঘুরে এসে বলল, একটা বড় ড্রামে জল ভরা আছে। কল থেকে জল পড়ছে না।

হোটেলে নিজেদের মালপত্র রেখে ফের গাড়িতে। এক শহিদের বাড়িতে যাচ্ছি। আমাদের সঙ্গে আছেন বিজনবাড়ির সেই গাইড। পথে পড়ল রাম্মাম নদী। তার কথা আগে বলেছি। সেই নদীর অপর পারে সিকিম। আমাদের গাড়ি নদীর ওপরে সেই টলমলে ব্রিজ পেরিয়ে ঢুকল সিকিমে। গাড়ির তেল ফুরিয়ে এসেছে। দার্জিলিংয়ে তো কোথাও তেল নেওয়ার উপায় নেই, পেট্রল পাম্পগুলো বন্ধ।

সিকিমে যেখানটায় গাড়ি থামল সেখানে বেশ গঞ্জের মতো জায়গা। দোকানপাট, রেস্তোরাঁ সব খোলা, চারপাশে লোকজনের জটলা। তেল নিয়ে গাড়ি ফের ঢুকল দার্জিলিংয়ে। তারপর যে শহিদের বাড়িতে পৌঁছলাম, তাঁর নাম বিমল শাসনকর। সেই বাড়ির কথা আগে লিখেছি। বিমলদের বাড়ি থেকে আবার হোটেলে। এখানে খাবার মেলে না। খানিক দূরে এক গোর্খা পরিবারে আমাদের রাতে খাওয়ার বন্দোবস্ত। সেখানে এক বয়স্ক মহিলা খুব যত্ন করে খাওয়ালেন গরম রুটি, কোয়াশের তরকারি, ডাল, আলু ভাজা। টেবিলে একটা ডিশের ওপরে কাঁচা লংকাও ছিল।

ওখানকার রাত একেবারে নিঝুম। কান পাতলে দূরে মৃদু কুলকুল শব্দ শোনা যায়। কোনও পাহাড়ি ঝরনার শব্দ।

২১ জুলাই, সকালবেলা।

এই পাখি ডাকা সকালে আমাদের হোটেলে হাজির হল দুই সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ যুবক। তারা দার্জিলিংয়ের কলেজে পড়ে। এখন কলেজ বন্ধ হয়ে আছে, তাই বাড়ি ফিরে এসেছে। বেশ সুদর্শন, হাসিখুশি ছেলে তারা, পোশাক-আশাক, চুলের ছাঁট, সবই ফ্যাশনদুরস্ত, একজনের ডান হাতের কবজিতে পুঁতির গয়না। তারা ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে কথা বলছিল। আমাদের মধ্যে একমাত্র শ্যামবাবু ছাড়া কেউ ইংরেজিতে বিশেষ স্ট্রং নয়। শ্যামবাবুর ছেলে আমেরিকায় থাকে। তিনি কিছুদিন আগে ছেলের কাছে গিয়ে ইংরেজি বলা রপ্ত করে এসেছেন। তিনিই আমাদের হয়ে ছেলে দু'টির সঙ্গে কথা কইতে লাগলেন। আমরা মাঝে মাঝে ভাঙা হিন্দিতে একটা-আধটা প্রশ্ন করছিলাম।

শ্যামবাবু প্রথমেই বললেন, ইওর টেরিটোরি ইজ ভেরি স্মল। পার্লামেন্ট বা অ্যাসেম্বলিতে তোমরা কী করবে? যে ছেলেটির হাতে পুঁতির গয়না, সে বলল, দ্যাট উইল ডিপেন্ড অন এগ্রিমেন্ট। আমাদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের কী চুক্তি হচ্ছে, তার ওপরে সব নির্ভর করবে।

জয়গোপালদা ব্যাপারটা আরও স্পষ্ট করে বুঝতে চাইলেন। তিনি বললেন, একঠো আলগ রাজ্য কে লিয়ে যো পপুলেশন নেসেসারি হ্যায়, হিঁয়া পর পপুলশেন ইতনা জাদা নেহি হ্যায়। যো টেরিটোরি আপকা হ্যায়, উঁহা পপুলেশন কিতনা হ্যায়? মানে ওখানে একঠো লোকসভা হ্যায়। তারও খানিকটা আবার প্লেনল্যান্ডে চলে যাচ্ছে।

ছেলেটি বলল, মুম্বইয়ের পপুলেশন তো এখানকার চেয়ে অনেক বেশি। তো, ওহ কেয়া মুম্বই কো সেপারেট স্টেট দে সকতা হ্যায়?

আমার মনে হল, ছেলেটি বোঝাতে চাইছে, জনসংখ্যার ওপরে স্টেটহুড নির্ভর করে না। কোথাও বেশি জনসংখ্যা থাকলে পৃথক রাজ্য হবে,

কম লোক থাকলে হবে না, এমন ভাবা ঠিক নয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, মুম্বইতে তো অনেক লোক থাকে, তা বলে মুম্বই কি আলাদা রাজ্য হতে পারে? পারে না।

এই যুক্তির মধ্যে কিছু পরিমাণে ছেলেমানুষী আছে। তবে ছেলেটি খুব জোরের সঙ্গে তর্ক করছিল।

জয়গোপালদাও সমানে তর্ক চালিয়ে যাচ্ছেন। ইয়ে যো ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন হ্যায়, ওহ তো আপ মানতা হ্যায়? ছেলেটি বলল, হ্যাঁ।

জয়গোপালদা বলে চলেছেন, কোই কোই কনস্টিটিউশনকো ঝুটা মানতা হ্যায়। বোলতা হ্যায়, ইয়ে চেঞ্জ করনা পড়েগা। ছেলেটা বলে উঠল, মাওয়িস্ট, মাওয়িস্ট। মানে সে বোঝাতে চাইছে, মাওইস্টরা অমন বলে। জয়গোপালদা বলছেন, আপলোগ তো কনস্টিটউশন কো মানতা হ্যায়। কোনও পৃথক রাজ্য তৈরি হতে গেলে কত পপুলেশন দরকার তা কনস্টিটিউশনে পরিষ্কার করে বলা আছে। কিন্তু তোমাদের কি অত পপুলেশন আছে?

ছেলেটি বলল, পপুলেশন, অল টুগেদার, টু ক্রোর সামথিং। অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড। সো আই থিংক হিয়ার উই উইল বি এইটটি লাখস।

তার মানে সে বলতে চাইছে, বিশ্ব জুড়ে দু'কোটি বেশি গোর্খা জনজাতির মানুষ বাস করে। তার মধ্যে পাহাড়ে আছে প্রায় আশি লক্ষ।

এইবার অপর ছেলেটি বলে উঠল, অ্যাপ্রক্সিমেটলি উই আর ওয়ান ক্রোর হিয়ার। আপনারা যদি পপুলেশনের কথা তুলে আমাদের স্টেটহুড ডিম্যান্ড সাপ্রেস করতে চান, তা হলে আমরা বলব, নেবারিং স্টেট সিকিমকে দেখুন। হোয়াট অ্যাবাউট সিকিম? সিকিম তো অন্যান্য স্টেটের চেয়ে অনেক ছোট। লুক অ্যাট দ্য স্টেট অব গোয়া। ওখানে কত পপুলেশন আছে?

জয়গোপালদা বললেন, ওখানে তোমাদের গোর্খাদের চেয়ে বেশি লোক আছে। তুমলোগ কনস্টিটিউশন কো মানেগা আউর ইয়ে গোর্খাল্যান্ড কো দাবি করেগা, দোনো এক সাথ নেহি চলতা।

প্রথম ছেলেটি বলল, তা হলে কি আমরা আরও দশ সাল, বিশ সাল ওয়েট করব, কবে আমাদের পপুলেশন বাড়বে আর আমরা পৃথক স্টেট পাব্লা তারপর দু'জনেই বলতে লাগল, ইট ইজ নট অ্যান ইস্যু, ইট ইজ নট অ্যান ইস্যু।

তখন শ্যামবাবু বললেন, ইউ আর নট ডিম্যান্ডিং সেপারেট কান্ট্রি। ইউ আর ডিম্যান্ডিং এ সেপারেট স্টেট। কনস্টিটিউশন কা যো রুলস হ্যায়, ওহ রুলস আপকো লিয়ে অ্যাপ্লিকেবল হ্যায় কি নেহি, ওহ আপকো শোচনা পড়েগা।

দ্বিতীয় ছেলেটি তাও গোঁয়ারের মতো বলছিল, লেট মি টেল ইউ, দ্য আর্টিকেল থ্রি অব দ্য কনস্টিটিউশন প্রোভাইডস আস দি ডিম্যান্ড ফর স্টেটহুড। দি কনস্টিটিউশন ব্যাকস আস ইন দিস ম্যাটার, ওকে!

মনে হল জয়গোপালদা তার কথা শুনে বেশ বিরক্ত হয়েছেন। বাচ্চাদের মুখে পাকা পাকা কথা শুনলে বড়রা যেভাবে ধমক দেয়, তিনি অনেকটা সেইভাবে বললেন, এই শোনো, আমি একটা কথা বলব, কনস্টিটিউশনকে মেনে এই ডিম্যান্ড পূরণ হওয়া সম্ভবই না। এই দাবি তুলতে হলে অপোজ করতে হবে কনস্টিটিউশনকে। তিনি এই কথাগুলো হিন্দি করে বলেননি, শুদ্ধ বাংলায় বলেছিলেন। কিন্তু মনে হল ছেলেদু'টি বুঝতে পেরেছে।

তখন শ্যামবাবু তাদের বুঝিয়ে বলতে লাগলেন, ইওর ডিম্যান্ড ইজ নট রং। অলরেডি আই সাপোর্ট। মানে, ইওর প্রোটেস্ট অ্যান্ড এজিটেশন। মাই অর্গানাইজেশন, হিউম্যান রাইটস অর্গানাইজেশন, অলরেডি সাপোর্ট ইওর ডিম্যান্ড। দু'টি ছেলেই এক গাল হেসে বলল, থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ।

এই কথাটা বলতেই ঘরের পরিবেশ গেল পালটে। এতক্ষণ কথাবার্তার সুর ছিল চড়া, বেশ তর্কাতর্কি হচ্ছিল, এইবার বিতর্ক ছেড়ে বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনার পালা। আমরা বয়সে ওদের চেয়ে অনেক সিনিয়র, ওরা আমাদের থেকে বুঝে নিতে চাইল কয়েকটা ব্যাপারে।

দ্বিতীয় ছেলেটি জিজ্ঞাসা করল, আপনারা যেসব ক্রাইটেরিয়ার কথা বলছেন, আগামী দিনে সেসব যদি ফুলফিল হয়েও যায়, তখন কি আমরা আলাদা রাজ্য পেয়ে যাব? ওরা কি তখন আর সিআরপি পাঠিয়ে আন্দোলন দমন করতে চাইবে না?

প্রশ্নটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। সাংবিধানিক শর্তগুলি পূরণ হয়ে গেলেই কি পৃথক রাজ্য পাওয়া যাবে? সরকার কি সংবিধান মানবে? সরকার কি সবসময় সংবিধান মেনে কাজ করে?

জয়গোপালদা অবশ্য এত জটিল প্রশ্নের মধ্যে না গিয়ে বললেন, তোমাদের একটা ব্যাপার ঠিক করতে হবে। আমাদের সংবিধান ঠিক না ভুল! যদি বল ভুল, তার বিরুদ্ধে লড়তে হবে। আর যদি বল, ভালো কনস্টিটিউশন, আচ্ছা হ্যায়, সাচ্চা হ্যায়, তবে এইসব ডিম্যান্ড নেহি চলেগা।

শ্যামবাবু বললেন, এক দাবি আপ কর সকতা হ্যায় যে কনস্টিটিটিউশন কো অ্যামেন্ড করনা হোগা। ওহ ভি প্রভিশন হ্যায়। সিচুয়েশন কো দেখকে, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট হ্যাভ ফুল রাইট তো অ্যামেন্ড দি কনস্টিটিউশন।

তখন ছেলেদু'টি জানতে চাইল, আগর হম কনস্টিটিউশনকো অ্যামেন্ড করেগা, তো আলগ স্টেট মিল জায়েগা?

অমনি জয়গোপালদা চেঁচিয়ে উঠলেন, নেহি নেহি নেহি নেহি, ইতনা সস্তা নেহি। ছেলেদু'টিও হাসল, ওহ তো বহুত লড়াই কি বাত হ্যায়।

এই কথাটা ওরা বোঝে। দু'টো প্রজন্ম ধরে ওরা গোর্খাল্যান্ডের জন্য লড়াই করছে। লড়াই ছাড়া যে কিছু পাওয়া যায় না, সেকথা ওরা খুব ভালো করে বোঝে।

এইখানে আমাদের বাঙালি ছেলেদের কথা মনে হল। সেই সাতের দশকের শুরুতে নকশাল আন্দোলনে পরাজয়ের পর থেকে তারা আর লড়াইয়ের ধারেকাছে নেই। বেচারারা আগে সিপিএমে ভিড়ে থাকত, এখন তৃণমূলে। সবসময় রুলিং পার্টির দিকে আছে। কেবলই ভাবে ক্ষমতাবান লোকেদের তোষামোদ করে জীবনে সুখে থাকবে। তাদের তুলনায় এই ছেলেগুলি অনেক ঝকঝকে। নিজেদের জাতের জন্য লড়াই করছে!

আমাদের কাছে নোনতা বিস্কুট ছিল, ওদের খেতে দিলাম। সেইসঙ্গে বুঝিয়ে বললাম, বাছারা, একটা কথা মনে রেখ। আলাদা রাজ্য হলেই কিন্তু সব সমস্যার সমাধান হবে না। ওই তো দেখেছ, ঝাড়খণ্ড হয়েছে, তেলেঙ্গানা হয়েছে, আরও গুটিকতক নতুন রাজ্য হয়েছে, তাতে সেখানকার লোকজনের কিছু সুবিধা হয়েছে কি? পৃথক গোর্খাল্যান্ড হলে এখানে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন হবে বলছ? কিন্তু বিহারে এবং অধুনা ঝাড়খণ্ডে তো একশ বছর ধরে টাটারা আছে, অনেক কলকারখানাও বানিয়েছে, তাতে ওখানকার ভূমিপুত্রদের কোনও উন্নতি হয়েছে কি?

ছেলেদু'টি চলে যেতে আমরা স্থানীয় এক মাস্টারমশায়ের বাড়িতে গেলাম। তাঁর স্কুল এখন বন্ধ। তিনি বললেন, আমাদের সবাই ঠকিয়েছে। কেন্দ্র ঠকিয়েছে, রাজ্য ঠকিয়েছে, আমরা যে ব্যক্তিকে দু'বার এমপি করে পার্লামেন্টে পাঠিয়েছি, তিনিও পার্লামেন্টে গিয়ে গোর্খাল্যান্ডের কথা ভুলে গেছেন।

তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, এই যে এতদিন ধরে বন্‌ধ চলছে, আপনারা সমস্যায় পড়ছেন না? আর কতদিন আপনারা বন্‌ধ চালিয়ে যেতে পারবেন? তিনি বললেন, ভুলে যাবেন না, আমরা প্রকৃতির সন্তান। প্রকৃতি থেকেই বাঁচার উপকরণগুলি সংগ্রহ করে নিতে পারি। বাইরে থেকে খাদ্যদ্রব্য বা নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তু না এলেও দিব্যি জীবন চালিয়ে নিচ্ছি। আমাদের মনোবল অটুট। বন্‌ধ আরও অনেকদিন চলবে।

মাস্টারমশায় আমাদের নির্দিষ্ট করে বলেননি, কীভাবে তাঁরা প্রকৃতি থেকে জীবনধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি সংগ্রহ করছেন। কিন্তু তাঁর কথা নিশ্চয় সত্য। না হলে এতদিন ধরে পাহাড়ে বন্‌ধ চলতে পারছে কী করে?

আমাদের এখনও ব্রেকফাস্ট হয়নি। গত রাতে যাদের বাড়িতে খেয়েছিলাম, এখন তাদের বাড়িতেই জলখাবারের বন্দোবস্ত। ওখানে আমাদের সামনে ধরে দিল রুটি, কোয়াশের তরকারি, খুব ঝাল একরকমের আচার আর লিকার চা।

এইবার গন্তব্য আর এক শহিদের বাড়ি। আবার আমরা সেই টাটা সুমোর সওয়ার। এখন আর সঙ্গে জে কে নেই। তিনি বিদায় নিয়েছেন। শিলিগুড়ি থেকে যে যুবকটি গাইড হিসাবে ছিল, সে এখন আমাদের সঙ্গে।

বিজনবাড়ি শহর ছাড়িয়ে, কিছুক্ষণ ধরে চড়াই-উতরাই পেরিয়ে পৌঁছানো গেল শহিদের বাড়ির কাছাকাছি। পিচ রাস্তার ওপরে গাড়ি দাঁড়িয়ে রইল। আমরা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এক মেঠো পথে উঠছি ওপরের দিকে। ওইখানে পাহাড়ি গ্রাম।

টিনের বাড়ি, মাথাতেও টিনের চাল। উঠোনে মুরগি চরে বেড়াচ্ছে। উঠোন পেরলেই হা হা করা খাদ। উঠোনের ধার বরাবর বাঁশের বেড়া দেওয়া। ওখানে এক কিশোরী দাঁড়িয়ে, আমাদের দেখে লাজুক মুখে হাসছে। তার কোলে এক ফুটফুটে শিশু। সে বলল, শিশুটির জ্বর হয়েছে। ওইখানে আরও গুটিকতক বাড়ি আছে। তাদের বাড়ির ছেলেরাও শহিদের বন্ধু ছিল। একসঙ্গে মিছিল-মিটিংয়ে যেত। দু'-একজন গুলিতে আহত হয়েছে।

শহিদের মাকে দেখলাম, মাঝবয়সী এক মহিলা। পরনে নেপালি পোশাক, হাতে শাঁখা আর পলা। খুব শান্ত, শোকস্তব্ধ চেহারা। প্লাস্টিকের চেয়ার পেতে আমাদের বসতে দিলেন। আশপাশের বাড়ি থেকে আরও কয়েকজন যুবক-যুবতী হাজির হল। আমাদের সঙ্গে কথা বলবে।

আমরা প্রথমে জিজ্ঞাসা করলাম, যিনি মারা গেছেন, তাঁর নাম কী?

একটি মেয়ে বলল, সুনীল রাই।

তিনি কত তারিখে মারা গেছেন?

মেয়েটি বলল, সতেরোই জুন।

উনি আপনার কে হতেন?

কাজিন ব্রাদার। চাচা কা বেটা।

এক যুবক আমাদের কাছে জানতে চাইল, আপনাদের অর্গানাইজেশনের নাম কী?

বাড়ির মেয়েরা আমাদের শরবৎ খেতে দিল।

সুমন গোস্বামী বললেন, আমরা আপনাদের কথা শুনতে এসেছি। এই বাড়ির একজন শহিদ হয়েছেন। তাঁর কথা শুনতে এসেছি। আমরা এই মুভমেন্টের বন্ধু। শত্রু নই। আমরা জানতে চাই, এখানে পুলিশ অত্যাচার করছে কি? করলে কীভাবে করছে? আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে গভর্নমেন্ট কোনও স্টেপ নিয়েছে কি?

জয়গোপালদাও বললেন, আমরা এখানে হিউম্যান রাইটস ভায়োলেশন নিয়ে জানতে ও বুঝতে এসেছি।

একটু আগে যে কিশোরী বাচ্চা কোলে নিয়ে উঠোনে দাঁড়িয়েছিল, সে এতক্ষণে ঘরে ঢুকল। সবাই বলল, ওই হল সুনীলের বাচ্চা। সবেমাত্র এক বছর বয়স। আর একটু বড় হয়ে ছবি দেখে বাবাকে চিনবে।

এক যুবক আমাদের বলল, শিশুটির বয়স একবছর পূর্ণ হয়েছে সদ্য। ওর বাবা যখন মারা যায় তখন একবছরও হয়নি। সতেরই জুন সুনীলকে সিআরপি গুলি করে। সে পঁচিশ তারিখে মারা যায়।

-আপনিও কি মিছিলে গিয়েছিলেন?

-আমি গিয়েছিলাম, আরও অনেকে গিয়েছিল। পুরো গ্রামের লোক গিয়েছিল।

তারপর সে একটি মেয়েকে দেখিয়ে বলল, এই হচ্ছে সুনীলের বউ।

-কী নাম আপনার?

মেয়েটির ভারী লজ্জা। সে আমাদের প্রশ্ন শুনে একবার বিব্রত চোখে এদিক ওদিক তাকাল।

সে হিন্দি অথবা বাংলা ভালো বুঝতে পারে না। যুবকটি বলল, আপনারা হিন্দিতে প্রশ্ন করুন, আমি ওকে নেপালিতে অনুবাদ করে দেব।

আমরা প্রশ্ন করলাম, আপনার স্বামীর শহাদৎ নিয়ে কিছু বলবেন? গোর্খাল্যান্ডের দাবি নিয়ে কিছু বলবেন?

এইরকম রাজনৈতিক প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে সে থতমত খেয়ে গেছে মনে হল। মাথা নিচু করে ফের এদিক-ওদিক দেখছে। ওর আত্মীয়-স্বজনরা বোঝাতে লাগল, ওনারা গোর্খাল্যান্ডের দাবি নিয়ে জানতে চাইছেন। কিছু বল।

তখন সে খুব মৃদু স্বরে বলতে শুরু করল। তখন জয়গোপালদা বলছেন, জোরসে বোলো জোরসে বোলো।

তারপর মেয়েটি নীচের দিকে তাকিয়ে নেপালি ভাষায় কয়েকটি বাক্য বলল। পাশে বসে থাকা যুবকটি অনুবাদ করে দিল, ও বলছে, আমার স্বামী গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে আন্দোলন করতে গিয়ে শহিদ হয়েছেন। গোর্খাল্যান্ড আমাদের পেতেই হবে।

যুবকটি আমাদের কাছে ওই পরিবারের অবস্থা বুঝিয়ে বলল। এই বাড়িতে সুনীলের এক দাদা থাকেন। তাঁর মেয়েকেও সুনীলই পালন করত। তার এক ছোট ভাই আছে। তার ছেলেমেয়েদেরও সুনীল দেখাশোনা করত।

-সে কী করত?
-ওহ মিস্তিরি থা। কার্পেন্টার। বাড়ির সব খরচ সুনীলই চালাত। বাচ্চাদের স্কুলের ফি দিত। ইনলোগোঁকো ইনসাফ মিলনা চাহিয়ে। কমপেনসেশান মিলনা চাহিয়ে।
বন্দনা নামে মেয়েটি মাথা নিচু করে বসে আছে। এখন তার চোখে টলটল করছে জল।
যুবকটি বলছেন, বিমল গুরুং হমে বোলা, বাদ মে দেখেঙ্গে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকারও দায়িত্ব এড়াতে পারে না। রাজ্য সরকারের পুলিশই সুনীলকে মেরেছে।
-গুলিচালনার দিন কী ঘটেছিল?
-আমরা সবাই মিছিলে গেছি, হঠাৎ শুনি গুলি চালিয়েছে। একজনের গুলি লেগেছে। কার গুলি লেগেছে খোঁজ নিতে গিয়ে দেখি সুনীল। তার দেহটা মিলিটারির লোকেরা ঘিরে আছে। আমরা বললাম, আরে এ তো আমাদের গাঁয়ের ছেলে। ওর বডিটা দাও, আমরা গাঁয়ে নিয়ে যাব। মিলিটারি বলল, না, আমরা হাসপাতালে নিয়ে যাব। কিন্তু আমরা তখনই বুঝেছি, সুনীল আর বাঁচবে না। তার মাথায় গুলি লেগেছিল। ব্রেন কো পুরা বাহার হো গয়া থা। এই দেখুন ছবি, বলে আমাদের মোবাইলে মৃতদেহের ছবি দেখাল, মাথায় সাদা ব্যান্ডেজ করা।
পাশে একটা বাড়িতে একজনের গুলি লেগেছে শুনেছিলাম, তাদের বাড়িতে গিয়ে শুনি সবাই গেছে হাসপাতালে। আহত যুবকটিকে দেখতে গেছে। বাড়ির বাইরে এক কিশোর দাঁড়িয়েছিল, তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কি এদের বাড়ির কেউ হও? সে বলল, যার গুলি লেগেছে, আমি তার ভাগনে। আমরা জানতে চাইলাম, তোমার মামার নাম কী? সে বলল, দিলে সুব্বা। আমরা প্রথমে পরিষ্কার বুঝতে পারিনি। তাই বললাম, মামার নামটা আর একবার বল। সে এবার চেঁচিয়ে স্পষ্ট করে উচ্চারণ করল, দিলে সুব্বা, দিলে সুব্বা।
এখন দুপুর। দু'টো-আড়াইটে বাজে। এবার ফেরার পালা। রাস্তার ওপর দিয়ে যত্রতত্র বয়ে চলেছে অনেক পাহাড়ি ঝরনা। আমাদের এক বৈজ্ঞানিক ভাগিরথীকে প্রশ্ন করেছিলেন, নদী তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ? নদী বলেছিল, মহাদেবের জটা হইতে। এই পাহাড়ি পথে সেই কথাটা মনে পড়ে গেল। এখানে অসংখ্য পাহাড়ি ঝরনা মহাদেবের জটাজুটের মতো ছড়ানো।
আমরা ফের পেরিয়ে গেলাম রাম্মাম নদী। গাড়ি আবার সিকিমে ঢুকল। সেই বাজার। এই অবধি যাবে আমাদের টাটা সুমো। আর যাবে না। গাইড আর ড্রাইভার দু'জনেই বলল, এখান থেকে শিলিগুড়ি ফেরার গাড়ি পেয়ে যাবেন।
একটা ট্রেকার পাওয়া গেল। সেই গাড়ি আমাদের নামিয়ে দিল শিলিগুড়ি মোড়ে। পরদিন বেলা এগারোটায় প্রেস কনফারেন্স। কথা ছিল আর একটু দেরিতে হবে কিন্তু রিপোর্টাররা আগেভাগে জড়ো হয়ে হল্লা শুরু করল, অত দেরি করলে চলবে না, শিলিগুড়িতে মমতা ব্যানার্জি আসছে, আমাদের যেতে হবে। আপনাদের প্রেস কনফারেন্স তাড়াতাড়ি সেরে ফেলুন।

৪

শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবেই প্রেস কনফারেন্স। রিপোর্টাররা অনেকে বেশ সুন্দর লাল-নীল জামা পরে এসেছে। একটু পরেই ভিভিআইপি-র খবর নিতে যাবে, সম্ভবত তাই অমন সাজ। এদিকে আমরা তো তড়িঘড়ি চলে এসেছি, ভালো জামাকাপড় পরার সময়ই পাইনি। এমনকী ধীরাজদা সুদ্ধ একটা আটপৌরে জামা পরে আছেন।
ধীরাজদা সমবেত রিপোর্টারদের বুঝিয়ে বললেন, গোর্খাদের আত্মপরিচয় সংক্রান্ত সমস্যা দীর্ঘদিনের। তার ওপরে মমতা ব্যানার্জি স্কুলে বাংলা ভাষাকে বাধ্যতামূলক করতে চাওয়ায় অগ্নিতে ঘৃতাহুতি হয়েছে।
এপিডিআরের কেন্দ্রীয় তথ্যানুসন্ধানী দল গত ২০ ও ২১ জুলাই দু'টি ভাগে বিভক্ত হয়ে কার্শিয়াং, সোনাদা, দার্জিলিং, বিজনবাড়ি, কালিম্পং ইত্যাদি জায়গা ঘুরে দেখেছে। আন্দোলনকারী, সাধারণ মানুষ এবং প্রশাসনের সঙ্গে কথাও বলেছে। প্রতিটি জায়গায় মানবাধিকার লংঘনের ভুরি ভুরি নিদর্শন পাওয়া গেছে।
সিংমারি, সোনাদা ও মিরিকে মোট ন'জন নিহত হয়েছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁদের শরীরের উপরিভাগে গুলি লেগেছে। ময়না তদন্তের ভিডিওগ্রাফি করা হয়নি। পুলিশ বলছে, আমরা গুলি চালাইনি। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন, পুলিশই চালিয়েছে।
পাহাড়ে বর্তমানে তীব্র খাদ্য সংকট চলছে। সরকার বলছে, পাহাড়ে বন্‌ধ চলছে, তাই খাবার পাঠানো যাচ্ছে না। অথচ আমরা দেখেছি, পাহাড়ে পুলিশ বা আধা সেনা দিব্যি পাঠানো যাচ্ছে। তা হলে খাবার পাঠাতে বাধা কোথায়? আসলে সরকার বন্‌ধের অছিলায় ইচ্ছা করে ওখানে খাবার পাঠাচ্ছে না। এইভাবে পাহাড়ের মানুষের খাদ্যের অধিকার লংঘন করছে।
রিপোর্টাররা খুব আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইছিল, লাইব্রেরি বা হেরিটেজ ভবনে আগুন দেওয়া নিয়ে কী বলবেন?
আমরা জানি, রিপোর্টাররা সকলেই শিক্ষিত, রেগুলার বই পড়ে, লাইব্রেরিতেও যায়। আমরা রোজ সকালে খবরের কাগজে তাদের শিক্ষাদীক্ষার পরিচয় পেয়ে থাকি। সুতরাং তারা লাইব্রেরি ধ্বংস করার কথা শুনে এত উতলা হবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই।
ধীরাজদা তাদের প্রশ্নের জবাবে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বললেন, আন্দোলনকারীরা অনেক সময় সভ্যতা ও বিচার-বিবেচনা বিরোধী কাজ করছেন। হেরিটেজ ভবন বা লাইব্রেরি ধ্বংস করার ঘটনাগুলিকে এপিডিআর তীব্র নিন্দা করছে।
তবে আমরা একথাও জানি যে, পুলিশের লোকেরা অনেকসময় নানারকম দুষ্কর্ম করে আন্দোলনকারীদের ওপরে দোষ চাপায়। এক্ষেত্রে ভাঙচুর বা অগ্নিসংযোগের পিছনে কারা আছে, তাও খতিয়ে দেখতে হবে।
দার্জিলিংয়ের চা শিল্পের বর্তমান অবস্থা নিয়েও এপিডিআর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। আন্দোলনের জন্য চা বাগানগুলি বন্ধ হয়ে আছে। চা গাছের উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণও হচ্ছে না। ফলে আগামী দিনে দার্জিলিংয়ের চায়ের গুণমান কতদূর বজায় থাকবে, তা নিয়ে সংশয় থাকছে।
সাংবাদিক বৈঠকের পরে রিপোর্টাররা সব মমতার খোঁজ করতে গেল। আর আমরা চললাম জলপাইগুড়ি সেন্ট্রাল জেলের দিকে। আমাদের বন্ধু রাজা সরখেল ওইখানে বন্দি। রাজা ভারী অমায়িক ছেলে। দেখা হলেই সুন্দর করে হেসে কথা বলে। সরকার তাকে ভীষণ বিপজ্জনক

সন্ত্রাসবাদী বলে বন্দি করে রেখেছে।
রাজার সঙ্গে গণতান্ত্রিক শিবিরের ঘনিষ্ঠতা অনেকদিনের। তার জন্ম ষাট সালে। সাতের দশকের শুরুতে যখন কলকাতা ও সন্নিহিত অঞ্চলে নকশাল আন্দোলন দানা বেধে উঠল, সে তখন হাফ প্যান্ট পরা কিশোর। আন্ডার গ্রাউন্ডে থাকা দাদাদের জন্য জরুরি খবরাখবর বয়ে নিয়ে যেত। সমর্থকদের বাড়িতে প্রতি সপ্তাহে দিয়ে আসত দেশব্রতী পত্রিকা।
ওই সময় রাজা খুব বড় কয়েকজন বামপন্থী নেতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। তরুণদা, বিজয়দা, শ্যামলদার মতো মানুষ, যাঁরা পরবর্তীকালে অন্ধ্র-বিহার-দণ্ডকারণ্যের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে মাওবাদের প্রসার ঘটিয়েছিলেন, সে তাঁদের সবাইকে চিনত। কিশোর বেলায় তাঁদের কাছে শুনেছিল দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ, জারের শীতপ্রাসাদ দখল, লং মার্চ আর ভিয়েতনামের কথা। তারপর সাতের দশকের শেষদিক থেকে সে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে। তার অনেক বন্ধু বাড়ি ফিরে গেছে। কিন্তু সে এখনও ওই পথেই আছে।
রাজা পাড়ায় খুব পপুলার। স্থানীয় ব্যবসায়ী সমিতির সেক্রেটারি। এপিডিআরেরও সদস্য। তাকে রিকশওয়ালা আর হকাররা খুব ভালোবাসে। প্রায়শই রাজার স্ত্রী শুক্লার কাছে খোঁজ নেয়, দাদা কেমন আছে? মাঝে একবার দাঁত তোলার জন্য তাকে মৌলালির আর আহমেদ ডেন্টাল কলেজে নিয়ে এসেছিল, ওখানে দেখা করতে গিয়েছিল পাড়ার অনেকে। টিএমসি, কংগ্রেস, এসব দলের লোকেরাও গিয়েছিল।
২০০৯ সালের পাঁচই অক্টোবর পুলিশ একইসঙ্গে রাজা ও প্রসূন চট্টোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করে। অভিযোগ, পশ্চিম মেদিনীপুরে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কনভয় লক্ষ্য করে বিস্ফোরণ ঘটানোর ষড়যন্ত্রে তাঁরা যুক্ত। গ্রেপ্তারের পরে সিজার লিস্টের খানিকটা অংশ ফাঁকা রেখে তাঁদের দু'জনকে সই করিয়েছিল। পরে সেই ফাঁকা জায়গায় অনেক কিছু লিখে দিয়েছে।
প্রথমে রাজা আর প্রসূনকে একই জেলে রেখেছিল। পরে পুলিশের ভয় হল ওরা জেল পালানোর ষড়যন্ত্র করছে। তারপর রাজাকে জলপাইগুড়ি জেলে ট্রান্সফার করে দিল। আমরা শুনেছি, ষড়যন্ত্রের কথাটা বানানো, আসলে সরকার ভেবেছে, দীর্ঘকাল নিঃসঙ্গ অবস্থায় রেখে দিতে পারলে মাওবাদীদের মনোবল ভেঙে যাবে। তাই তাদের নানা জেলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছে।
মমতা ব্যানার্জি যাতে সুখে রাজ্যপাট চালাতে পারেন, সেজন্য রাজার মতো তেজি ছেলেদের শারীরিক ও মানসিকভাবে ধ্বংস করতে চান। রাজাদের দল একসময় মমতাকে বন্ধু ভেবেছিল। ক্ষমতায় এসে তিনি সেই বন্ধুত্বের প্রতিদান দিচ্ছেন।
একে নিঃসঙ্গতা, তার ওপরে জেলের অসহ্য পরিবেশ। ওখানকার খাবার মুখে তোলা যায় না। শুক্লা জেলে রাজার জন্য আচার দিয়ে আসে, সেই দিয়ে খাবার মেখে খায়। ওখানে যে জল দেয়, তাও পানের অযোগ্য। সব মিলিয়ে জেল একটি নরক বিশেষ।
ওখানে যিনি জেলার, তিনি কিন্তু বেশ চমৎকার হাসিখুশি মানুষ। বাড়ি উত্তরপ্রদেশে। বেশ লম্বা, ফরসা, সুন্দর দেখতে, মনে হয় উঁচু জাতেরই লোক হবেন। জামাকাপড়ও পরেছেন উজ্জ্বল রংয়ের, ভারী স্মার্ট লাগছে। তাঁর সঙ্গে আমাদের আলাপ হতে বললেন, আসলে কী জানেন, জেলের মধ্যে একটা গ্যাং আছে, তারাই বন্দিদের খাবার চুরি করে। আমি অনেকদিন ধরে ওই চক্রটাকে ভাঙার তালে আছি। একবার ওদের শায়েস্তা করি, তারপর দেখবেন কিচ্ছু সমস্যা থাকবে না।
এই জেলার ভদ্রলোক এত মিষ্টি করে কথা বলেন যে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়। অবশ্য জেলে গ্যাংয়ের কথাটা পুরোপুরি মিথ্যে নয়। আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানি, সব জেলেই যাবজ্জীবন দণ্ডিত কয়েদিদের অমন গ্যাং থাকে। তারা নতুন কোনও আন্ডার ট্রায়াল বন্দি এলেই খোঁজ নেয় সে গরিব না বড়লোক। গরিব হলে তার প্রাপ্য খাবারের পরিমাণ আর গুণমান, দুই-ই হবে খুব খারাপ। আর বড়লোক হলে তাকে বলবে, টাকা ফেলুন, পাতে পড়বে খাসির মাংসের বড় বড় পিস।
আমরা জেলারের সঙ্গে কথা বলছি, এমন সময় রাজাকে ওখানে আনল। সাদা পাজামা আর শার্ট পরা, দেখা হতে আগের মতোই একগাল হাসল, তারপর হাত মেলাল। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কোনও অসুবিধা হচ্ছে কি? সে জেলারকে বলল, আপনার এখানে জল অমন খারাপ কেন মশাই?
জেলার মেনে নিলেন, সত্যিই জল বড় খারাপ। আসলে রিজার্ভারে যখন জল ফুরিয়ে আসে, তখন নীচের দিককার জলে আয়রন বেশি থাকে। কিন্তু আমি নিরুপায়। এই বলে তিনি হাত উল্টে দিলেন।
কেন নিরুপায়?
তিনি বলছেন, জলের ব্যাপারটা তো পিডব্লুডি দেখে। আমাদের কোয়ার্টার্সেও ওরকম জলই পাঠায়, মাইরি বলছি। তবে চিন্তা করবেন না, আমি এই সব প্রবলেম ওভারকাম করার চেষ্টায় আছি।
রাজা আর একটা প্রশ্ন করল, আমার সহবন্দি শম্ভু মুর্মু দাঁতের যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছেন, তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাননি কেন? তিনি বললেন, নিশ্চয় নিয়ে যাব, কিন্তু ব্যাপারটা কী জানেন তো, সে তো আর সাধারণ বন্দি নয় যে, যাহোক করে পাঠিয়ে দিলেই হল। সে মাওবাদী, তাকে এসকর্ট করে নিয়ে যেতে হবে তো। আমি কর্তাদের কাছে আর্জি জানাচ্ছি আরও পুলিশ পাঠান, এক মাওবাদী বন্দিকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু ওনারা খালি বলছেন, পুলিশ পাব কোথা? এখন আমাদের হাতে পুলিশ নেই। সবাই গেছে দার্জিলিং, কালিম্পং অথবা কার্শিয়াংয়ে। ওখানে গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন চলছে, তাই অত পুলিশ পোস্টিং।
আমরা লক্ষ করলাম, এই জেলার ভদ্রলোক প্রতিটি অভিযোগের খুব বিশ্বাসযোগ্য জবাব দিতে পারেন। আরও একটা লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, রাজা তাঁকে কোনও ব্যক্তিগত অসুবিধার কথা জানায়নি। সে জেলের সব বন্দির হয়ে জলের সমস্যার কথা বলেছে, আর বলেছে শম্ভুনাথ মুর্মুর কথা, যে তার কমরেড।

৫

রাজার সঙ্গে দেখা করে আবার এপিডিআর অফিসে ফিরছি। ঘণ্টাকয়েক আগে প্রেস কনফারেন্সে ধীরাজদা যে কথাটা বলেছিলেন তা মনে পড়ছিল, আন্দোলনকারীরা সভ্যতা ও বিবেচনা বিরোধী কাজ করেছেন। হেরিটেজ ভবন বা লাইব্রেরি ধ্বংস করার ঘটনাগুলিকে আমরা তীব্র নিন্দা করছি...।

ধীরাজদা সন্দেহ করছেন পুলিশের এজেন্ট প্রভোকেটররা ওইসব করে থাকতে পারে, তবে আমার মনে হয় আন্দোলনকারীরা করলেও আশ্চর্যের কিছু নেই। কেননা সব আন্দোলনেই অমন হয়।

আমি দেখেছি, শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা সবসময়ই হেরিটেজ বা লাইব্রেরি ধ্বংসের খুব নিন্দা করেন অথচ ইতিহাসের এমনই নিয়ম যে, কোনও বড় গণ আন্দোলন, বিপ্লব অথবা প্রতিবিপ্লবের বেলায় লোকে ওইসব করবেই।

আমরা বইতে পড়েছি, প্যারি কমিউনের সময় মজুররা একটি মনুমেন্ট ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল, ভাঁদোম স্তম্ভ বলত তাকে। তার সঙ্গেও ফরাসি জাতির অনেক ঐতিহ্য, গৌরবগাথা জড়িত ছিল। অস্টারলিজের যুদ্ধ জয় করে নেপোলিয়ন স্তম্ভটি বানিয়েছিলেন। শত্রুর থেকে দখল করা কামানগুলো গলিয়ে যে ব্রোঞ্জ পাওয়া গিয়েছিল, তা দিয়ে বানানো হয়েছিল। স্তম্ভের ওপরে ছিল নেপোলিয়নের অশ্বারোহী মূর্তি। কিন্তু কমিউনের সাংস্কৃতিক দপ্তরের সভাপতি ফতোয়া দিলেন, ওই স্থাপত্যের কোনও শৈল্পিক মূল্য নেই। ভুতপূর্ব এক সম্রাটের যুদ্ধজয়কে গৌরবান্বিত করার জন্য স্তম্ভটি নির্মিত হয়েছিল। অমন স্মারক সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক ভাবাবেগে আঘাত করে। সুতরাং ওটি ভেঙে ফেল। কমিউনের পতনের কয়েকমাস পরে লন্ডন থেকে ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কিংমেনস অ্যাসোসিয়েশন একটা প্যাম্ফলেট ছেপে বার করেছিল, হয়েছিল, তাতেও দেখেছি, ভাঁদোম স্তম্ভ ভাঙার ঘটনাটিকে খুব উৎসাহের সঙ্গে সমর্থন করা হয়েছে। প্যাম্ফলেটটি এক জার্মান ভদ্রলোকের লেখা। তাঁর নাম কার্ল হাইনরিখ মার্কস।

ঊনিশশ সতেরর অক্টোবর বিপ্লবের পরেও বলশেভিকরা জারের রাশিয়ার অনেক স্মারক ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। সেগুলোও হেরিটেজই ছিল। আবার একানব্বই সালে যখন সেদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে সোভিয়েত ব্যবস্থার অবসান ঘটল, তখন অনেক জায়গায় লেনিনের মূর্তি ভাঙা পড়ল।

চিনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময়ে বলেছিল, 'চার পুরাতন'-এর সঙ্গে সম্পর্কিত সব হেরিটেজ গুঁড়িয়ে দিতে হবে। চার পুরাতন মানে পুরানো নিয়মকানুন, পুরানো সংস্কৃতি, পুরানো অভ্যাস এবং পুরানো ধ্যানধারণা।

বহুকাল আগে আমাদের কলকাতাতেও একটা হেরিটেজ ছিল, হলওয়েল মনুমেন্ট তার নাম। নবাব সিরাজদৌল্লার অন্ধকুপ হত্যায় মৃতদের স্মরণে গভর্নর হলওয়েল বানিয়েছিলেন। পরে স্বদেশী ইতিহাসবিদরা বললেন, অন্ধকুপ হত্যার কথাটা সাহেবদের বানানো। সেই শুনে রাগি ছেলেরা ওই স্মারক সরানোর জন্য আন্দোলন শুরু করল। তাদের নেতৃত্বে ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। সে চারের দশকের একদম শুরুর দিককার কথা।

বাষট্টিতে চিন যুদ্ধের সময় লেখক মনোজ বসু নিজের হাতে চিন ঘুরে এলাম বইটি পুড়িয়েছিলেন। বইটি তাঁরই লেখা। চিন ঘুরে এসে ওখানকার সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রশংসা করে লিখেছিলেন। যুদ্ধের সময় ওটি পুড়িয়ে প্রায়শ্চিত্ত করলেন।

সাতের দশকের শুরুতেও ছেলেরা মূর্তি ভাঙা, লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরিতে আগুন দেওয়া এইসব করত। ওইভাবে ঊনিশ শতকী নবজাগরণের হেরিটেজকে অস্বীকার করতে চেয়েছিল। কারণ তাদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী তা ইংরেজি শিক্ষিত, সাহেবভক্ত মধ্যবিত্তের নবজাগরণ। তাতে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ গরিব মানুষ, বিশেষত চাষিদের সর্বনাশ করার পাকা বন্দোবস্ত।

আবার ন'য়ের দশকের শুরুতে বাবরি মসজিদকে যারা ধ্বংস করল, তারাও আর একরকমভাবে হেরিটেজকে অস্বীকার করেছিল।

দু'হাজার তিন সালে ইরাকে যখন আমেরিকার সেনা ঢুকল, তখনও বাগদাদ জাদুঘরে রক্ষিত অনেক অতি প্রাচীন হেরিটেজ ধ্বংস করে দিয়েছিল। তার আগে আবার আমেরিকার ঘোর বিরোধী তালিবান গভর্নমেন্ট আফগানিস্তানে বামিয়ানের দু'টি বিশাল বুদ্ধমূর্তি ভেঙে ফেলেছিল। এখন আইসিস নামে একটি সংগঠনের কথা শোনা যাচ্ছে, তারাও নাকি পশ্চিম এশিয়ায় অনেক প্রাচীন সৌধ ও স্মারক ধ্বংস করেছে।

কিছুদিন আগে আমেরিকার একটা ঘটনার কথা কাগজে পড়লাম, সেখানেও ওই হেরিটেজ নিয়ে বেজায় ঝামেলা। আমেরিকার ভার্জিনিয়া প্রদেশে শার্লটসভিলে নামে একটা শহর আছে। শহরে লি স্কোয়ার নামে একটা জায়গায় রবার্ট এডওয়ার্ড লি নামে এক আদ্যিকালের সেনাপতির মূর্তি বহুকাল ধরে বসানো। মূর্তিটি শহরের অন্যতম হেরিটেজ বলা যায়।

শহরের নানা মানবাধিকারকর্মী সংগঠন, বামপন্থী সংগঠন ও কৃষ্ণাঙ্গরা বহুকাল ধরে দাবি জানাচ্ছিল, মূর্তিটি সরিয়ে ফেলতে হবে। কেননা ওই সেনাপতি দাসমালিকদের পক্ষের লোক ছিলেন। আমেরিকায় গৃহযুদ্ধের সময় লড়েছিলেন আব্রাহাম লিংকনের বিরুদ্ধে।

শার্লটসভিলের নগর পরিষদও মেনে নিয়েছিল সেই দাবি। কথা হচ্ছিল, মূর্তিটি প্রকাশ্য স্থানে না রাখাই ভালো। এদিকে ওখানে বর্ণবিদ্বেষীরাও সংখ্যায় কম নয়। তাদের কাছে রবার্ট এডওয়ার্ড লি রীতিমতো হিরো। গত বারই আগস্ট তারা মিছিল বার করল। তাতে কু ক্ল্যাক্স ক্ল্যানের লোকেরা ছিল, নিও নাৎসিরা ছিল, আরও যত রক্ষণশীল দলের লোকজন ছিল। তারা শহরের হেরিটেজস্বরূপ ওই মূর্তিটি রক্ষা করতে চায়। একই দিনে তাদের বিপক্ষে মিছিল বার করল মানবাধিকারকর্মী আর বামপন্থীরা। তাদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাও ছিল। তাদের দাবি, মূর্তিটি এখনই সরিয়ে ফেলতে হবে।

দুই মিছিলে বেধে গেল ধুন্ধুমার। তার মধ্যে জেমস অ্যালেক্স ফিল্ডস নামে এক অতি বদ ছোকরা বামেদের মিছিলের মধ্যে দিয়ে চালিয়ে দিল গাড়ি। সে দক্ষিণপন্থীদের সমর্থক। কৃষ্ণাঙ্গদের ওপরে তার জাতক্রোধ। তার গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে হিদার হেয়ার নামে এক মহিলা নিহত হলেন। আহত হলেন আরও অনেকে।

শ্বেতাঙ্গ বর্ণবিদ্বেষ তথা কৃষ্ণাঙ্গদের দাসত্বের হেরিটেজ নিয়ে আমেরিকায় এখনও লড়াই চলছে। একদল সেই হেরিটেজকে ধ্বংস করতে চায়। আর একদল চায় তাকে রক্ষা করতে। ওই নিয়ে শার্লটসভিলে বা আর কোনও জায়গায় আবার গন্ডগোলও বেধে যেতে পারে।

৬

কাগজে পড়ছিলাম, রাষ্ট্রসংঘ থেকে বলেছে, হেরিটেজ ধ্বংস করা মানে কালচারাল ওয়ারফেয়ার চালানো।

ঠিকই বলেছে।
শত্রুকে পরাস্ত করতে হলে তার সংস্কৃতিকেও ধ্বংস করতে হয়। যে কোনও শ্রেণি অথবা জাতি যদি অপর শ্রেণি বা জাতির বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করতে চায় তবে তাকে শত্রুর সংস্কৃতি তথা হেরিটেজকে ধ্বংস করতেই হবে।
গোর্খারা যে হেরিটেজ ভবন এবং লাইব্রেরিতে আগুন দিয়েছে, সেগুলো ব্রিটিশ সরকার অথবা পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তৈরি। উভয় শাসকই গোর্খাদের কেবল বিশ্বাসী ভৃত্যের ভূমিকায় দেখতে পছন্দ করেছে। গোর্খারা সত্যিই বহুকাল যাবৎ তাদের বশংবদ দারোয়ান অথবা সৈনিক হয়ে ছিল। কিন্তু গোর্খাদের নতুন প্রজন্ম আর ভুতপূর্ব প্রভু দের মানে না। তারা আত্মসম্মান দাবি করে, দাসসুলভ বশ্যতার মনোভাব ঝেড়ে ফেলে মাথা তুলে দাঁড়াতে চায়, এখন তাদের পুরানো হেরিটেজের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতেই হবে।
কিন্তু তারা লড়াইটা শেষ অবধি চালাতে পারবে কি?
এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আমি আগেই আশংকা প্রকাশ করেছিলাম, গোর্খা জাতির এই স্পিরিট, এমন আত্মত্যাগকে ব্যবহার করে কোনও সুযোগসন্ধানী নেতৃত্ব আখের গুছিয়ে নেবে না তো?
পরে ওদের সঙ্গে কথা বলে আমার ধারণা হয়েছে, এইবার তেমন নাও হতে পারে। পাহাড়বাসীরা সেই আটের দশক থেকে গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে লড়াই করে চলেছে। মাঝে ঘিসিংয়ের অনেক বজ্জাতিও দেখেছে। এখন তারা বেশ সচেতন। এবার আর নেতৃত্ব বিশ্বাসঘাতকতা করলে পার পাবে না। সম্প্রতি একটা ইংরেজি কাগজে পড়ছিলাম, বিমল গুরুং বলেছেন, আমি যদি গোর্খাল্যান্ডের দাবি ত্যাগ করি জনতা আমাকে ছাড়বে না। মনে হল, তিনি ঠিকই বলেছেন।
২১ জুলাই, দুপুর। এপিডিআর অফিস থেকে নিজেদের জিনিসপত্র গুছিয়ে বেরচ্ছি। এনজেপি থেকে শিয়ালদার ট্রেন ছাড়বে বিকালে। বেরনোর সময় দেখি অফিসের বাইরে সংগঠনের নাম লেখা সাইনবোর্ডটা ভেঙে ঝুলছে। বহু পুরানো ও ভারী সাইনবোর্ড। কারও মাথায় পড়লে অনর্থ ঘটবে।
স্থানীয় একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, ওটা হেরিটেজ বলে রেখে দিয়েছেন বুঝি?
তিনি বললেন, আরে না না, বদলে ফেলব শিগগিরি।

পাদটীকা

এইখানে আমার একটা কথা মনে পড়ল, এই কলকাতা শহরে আগে অনেক ব্রিটিশ রাজপুরুষের মূর্তি ছিল। সেসব ঔপনিবেশিক আমলের হেরিটেজ। ভাস্কর্য হিসাবে সেগুলো ছিল অতি উন্নত মানের। আমার বিশেষ করে লর্ড মেয়োর স্ট্যাচুর কথা মনে আছে, অশ্বারূঢ় মূর্তি, ঘোড়ার সামনের একটি পা শূন্যে তোলা।
সাতচল্লিশ সালের পরে দুই দশকেরও বেশি সময় জুড়ে ব্রিটিশ রাজপুরুষদের মূর্তিগুলো শহরের নানা জায়গায় সগৌরবে শোভা পেত। তখনকার দিনে স্বাধীনতা সংগ্রামীরা অনেকে জীবিত ছিলেন, তাঁদের অনেকে ব্রিটিশের জেলখানায় বন্দি থেকেছেন, লাঠি-গুলিও খেয়েছেন, তাঁরাও কেউ এই ব্যাপারটার মধ্যে অশোভন বা অযৌক্তিক কিছু আছে বলে মনে করেননি। আশ্চর্যের ব্যাপার, মূর্তিগুলি নিয়ে কটাক্ষ করেছিলেন ক্রুশ্চেভ। সাহেবদের স্ট্যাচু ওইভাবে যত্রতত্র সাজিয়ে রাখা তাঁর চোখেও বাড়াবাড়ি ঠেকেছিল।
১৯৫৫-য় সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন সম্পাদক নিকিতা সের্গেইয়েভিচ ক্রুশ্চেভ ভারত সফরে আসেন। সঙ্গে ছিলেন রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী নিকোলাই বুলগানিন। ক্রুশ্চেভ যখন দেখলেন, ব্রিটিশ রাজপুরুষদের মূর্তিগুলো স্বাধীন দেশেও সসম্মানে শোভা পাচ্ছে তখন ভীষণ অবাক হয়ে গেলেন।
তিনি খানিক পরিহাসের সুরে মন্তব্য করেছিলেন, আমরা ভারতের নানা প্রান্তে ঔপনিবেশিক প্রভুদের বানানো অনেক মূর্তি দেখেছি। ভারতীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধজয়ের স্মারক হিসাবে ওগুলো বানানো হয়েছিল। ভারতীয়রা সত্যিই ভারী মজার লোক। তাদের ধৈর্য অবিশ্বাস্য। আমরা তো ভেবেই পাই না, যে মূর্তিগুলো ভারতের স্বাধীনতা হারানোর কথা, ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীদের অত্যাচারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, ভারতীয়রা কীভাবে সেগুলো চারপাশে সাজিয়ে রেখে দিতে পারে।
আমরা তো বিপ্লবের পরে আগের জমানার বেশিরভাগ মূর্তি ভেঙে ফেলেছিলাম। শুধু বাছা বাছা কয়েকটা রেখে দেওয়া হয়েছিল। তাদের নীচে লিখে দিয়েছিলাম: আমাদের অত্যাচারী শাসকদের এইরকম দেখতে ছিল।
ক্রুশ্চেভের ওই বক্রোক্তির পরেও দীর্ঘকাল যাবৎ কলকাতায় ব্রিটিশ স্ট্যাচুগুলো কেউ সরায়নি। শেষে ঊনসত্তর সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের হুঁশ হল, ওগুলো আর প্রকাশ্য স্থানে থাকা ঠিক নয়। তখন কলকাতায় ও অন্যত্র নকশালবাড়ি আন্দোলনের গতি উর্ধ্বমুখী। ছেলেছোকরার দল ভীষণ ক্ষেপে আছে, পারলে যত মন্ত্রী আর রাজপুরুষের গর্দান নেয়। ওদের সবাইকে বলছে সাম্রাজ্যবাদের দালাল। এমন সময় অজয় মুখার্জির সরকার বলল, আমরা ভূতপূর্ব ব্রিটিশ প্রভুদের মূর্তিগুলো সরিয়ে দিচ্ছি। সুতরাং হে দেশবাসী, তোমরা জেনে রাখ, আমরা সাচ্চা দেশপ্রেমিক, সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী।
তারপর মূর্তিগুলো সরিয়ে ফেলা শুরু হল। যতদূর জানি, এক-এক করে মোট ৩৭টা মূর্তি সরিয়ে ফেলেছিল। মৃণাল সেন তাঁর ইন্টারভিউ সিনেমার শুরুতেই দেখিয়েছিলেন সেই অসামান্য দৃশ্য, বিরাট বিরাট ক্রেন দিয়ে আদ্যিকালের মূর্তিগুলো বেদী থেকে নামিয়ে ফেলা হচ্ছে। ওই ছবিতে মৃণাল সেনের প্রতিপাদ্য বিষয় হল, শহর থেকে মূর্তিগুলো সরানোই সার, সাহেবি পোশাক, চালচলন আর সংস্কৃতি এখনও জেঁকে বসে আছে ভদ্রলোকেদের মধ্যে। ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্র ছিল এক নিম্নমধ্যবিত্ত যুবক। তার একটা দামি চাকরি পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ইন্টারভিউতে সাহেবি পোশাক পরে যায়নি বলে চাকরিটা সে পেল না।
এখানে আমার বক্তব্য এই যে, দেশের শাসকদেরও অনেক সময় দেশপ্রেমিক সাজতে গিয়ে হেরিটেজকে লুকিয়ে ফেলতে হয়। অর্থাৎ দেশপ্রেমিক জনতা যেখানে দাসত্বের হেরিটেজকে ভেঙে অথবা আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করে সেখানে শাসকরা ভণ্ডামি করে অনেক সময় পুরানো কুকীর্তির স্মারকগুলো যত্ন করে লোকচক্ষুর আড়ালে সরিয়ে রাখে। বিক্ষুব্ধ জনতা যাতে শান্ত হয় সেজন্যই তারা ওরকম করে।